কর্মের সূত্র

Theory of Karma

(শ্রী হীরালাল ভাই ঠক্করের ৩৫টি ভাষণের সারাংশ এই গ্রন্থে)

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, বিন্ধ্যাচল, মীর্জাপুর

"এই স্থানটির এক বিশেষ প্রভাব আছে। এই স্থান অষ্টভূজা মন্দির ও কালীখো নিয়ে একটি ত্রিকোণ। আর তোমাদের বিন্ধ্যাচলের এই আশ্রমটি ঐ ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু।"

- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী

"কর্ম করা তোমার অধিকার কিন্তু ফলে নয় কখনও। কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হওয়া, কর্ম ত্যাগের প্রতিও প্রীতি না হওয়া চাই।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২|৪৭)

কর্মের সূত্র

THEORY OF KARMA

(শ্রী হীরালালভাই ঠক্করের ৩৫টি ভাষণের সারাংশ-এই গ্রন্থ)

বাংলা অনুবাদক

স্বামী চেতনানন্দ গিরি

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম,

বিন্ধ্যাচল, মীর্জাপুর (U.P.) 231307

কর্মের সূত্র (*Theory of Karma*)

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর ১২৫ তম আর্বিভাব-বর্ষ উপলক্ষ্যে - প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক : হ্যাপী মডেল স্কুল, বেনারস
এবং
স্বামী চেতনানন্দ গিরি
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, বিন্ধ্যাচল
মীর্জাপুর-231307 (উ.প্র.)

মূল্য : অমূল্য

অক্ষর বিন্যাস : অমিত সাহা

মুদ্রক : স্টার লাইন
বারাণসী-২২১০০১

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী

"যার যেভাবে ভাল লাগে তাঁকে ডাকো। তাঁর মহিমার কথা ভাবো। তাঁর ভাবের মধ্যে তোমার সকল কামনা ডুবিয়ে দাও। তিনি আপন স্বরূপ দেখা দেবেন।"
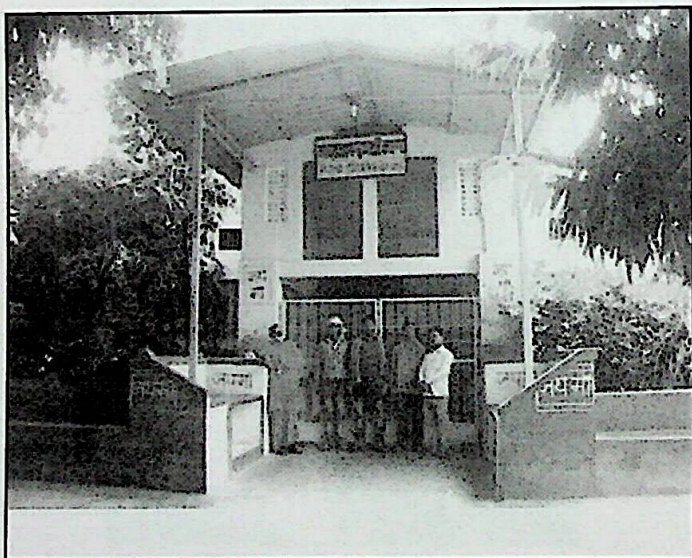
- শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী

দাতব্য চিকিৎসালয়,

বিন্ধ্যাচল-মায়ের আশ্রম

পঞ্চবটী সাধন কুটিয়া

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, বিন্ধ্যাচল

প্রভু শরণম্

আমরা জানি যে সৃষ্ট বস্তু মাত্র বিনাশশীল। তা সত্ত্বেও ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর প্রতি আমাদের আকর্ষণ সম্পূর্ণ ভ্রান্তির ফল। পরমাত্মা ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আকর্ষণ এবং অধিক নির্ভরশীলতা মায়া-মোহের ফলে হয়ে থাকে। মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী এবং নাশবান্ বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত এবং অধিক নির্ভরশীল হওয়া আধ্যাত্মিক-জীবনে ক্ষতির কারণ হয়।

মানব-কল্যাণের জন্য নিষ্কাম ভাবে অপরকে সহায়তা দান করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য। জাগতিক সকল উপভোগ্য বস্তুর সৎ-উপযোগ হওয়াও কাম্য।

সংসারের অনিত্য বস্তুর প্রতি মোহ, আসক্তি এবং অধিক নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে একমাত্র নিত্য ও অবিনাশী পরমাত্মার উপরই আশ্রয় গ্রহণ করাটাই আমাদের কর্ত্তব্য। কেননা একমাত্র তিনিই পরম সত্য এবং নিত্য।

বহু জন্মের পরে পরম সৌভাগ্যের ফলে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হয়ে থাকে। তাই বুদ্ধিমান মানুষ মৃত্যুর পূর্বে, শীঘ্রাতি-শীঘ্র আত্ম-কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হন। বিষয়ভোগ তো অন্যান্য সকল যোনিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং বিষয়-ভোগের তৃষ্ণা পূর্ত্তির জন্য দুর্লভ, অমূল্য মনুষ্য জীবন বৃথা নষ্ট করা উচিৎ নয়।

পরিচিতি

শ্রী হীরালাল ভাই ঠক্করের ৩৫টি ভাষণের সারাংশ "কর্মের সূত্র" (Theory of Karma) গ্রন্থরূপে প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দ বোধ করছি।

শ্রী হীরালাল ভাই ঠক্কর সরকারের রাজস্ব বিভাগে ৩৮ বছর চাকুরী করার পরে ডেপুটি কালেক্টর পদে থেকে ১৯৭৬ সালে আগস্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন এবং কর্ম-ব্যস্ততার ফলে তিনি তখন কোন গ্রন্থ রচনার সুযোগ পাননি। কিন্তু কর্মরত অবস্থায় তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণের ওপরে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে অনেক মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। পরে তাঁর ঐ সকল ভাষণগুলির সারাংশ সংগ্রহ করে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা আধ্যাত্মিক জগতের অমূল্য সম্পদ।

চাকুরীরত অবস্থায় তিনি যে সকল স্থানে ভাষণ প্রদান করেছিলেন সেগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থানগুলি হলো : থাসরা সৎ-সঙ্গ মণ্ডল, সুরেন্দ্রনগর—ব্রাহ্মসমাজ, ভূজ (কচ্ছ), কচ্ছ জিলার অন্তর্গত প. পূ. পান্ডুরং শাস্ত্রী—স্বাধ্যায়-মণ্ডল, গোধরা হাইস্কুল, থিওসফিকেল সোসাইটি এবং গোধরা রোটারী ক্লাবের সম্মিলিত সংস্থা, দীবদা কলোনী, সন্তরামপুর, মহেসানা লাইব্রেরী হল, আহম্মদাবাদে অবস্থিত থিওসফিকেল সোসাইটি, সূর্যদাসজী মহারাজ মন্দির, সারঙ্গপুর রাম-ভবন ইত্যাদি। সচিবালয় থেকে কর্ম বিরতির পরে তিনি মণিনগর, গণেশগলী এবং জয়হিন্দ হাইস্কুলে নিয়মিত ভাবে প্রবচন প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন গান্ধী নগর থিওসোফিকেল সোসাইটির সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট।

শ্রী হীরালাল ভাই দীবদা-কলোনীতে "কর্মের সূত্রের" উপর ৩৫টি

মূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন। সে সময়ে জনৈক ডেপুটি-ইঞ্জিনিয়ার সেগুলি কাগজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, ১৯৭৩ সালে সেই লিপিবদ্ধ ভাষণগুলির সারাংশ একটি পূর্ণাঙ্গীন পুস্তকরূপে প্রকাশিত হলো।

সমাজের কল্যাণ এবং জনগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে সুযোগ্য পাঠকবৃন্দের নিকট বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে, কেউ এটি বিক্রয় করতে পারবেন না। এক জনের পাঠ সমাপ্তির পরে অন্য জনকে এই বইটি পাঠ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

আধ্যাত্মিক কল্যাণের পক্ষে নিঃসন্দেহে এই পুস্তকটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। 'নদী এবং পুস্তক প্রবহমান হওয়াই শ্রেয়'। বইটির বহুল প্রচার হওয়া প্রকাশনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"মানব সেবাই প্রভু সেবা"।

এই বইয়ের বিক্রয় মূল্য : অমূল্য। (অর্থাৎ অর্থ মূল্য দ্বারা বিচার্য নয়।)

—গুজরাতী প্রকাশক

অনুবাদকের নিবেদন

লীলা পুরুষোত্তম পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ৪/১৭ নং শ্লোকে তাঁর শ্রীমুখে ব্যক্ত করেছেন, "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ"। অর্থাৎ কর্মের গতি অত্যন্ত গহন-দুর্বোধ্য। মানব সভ্যতার আরম্ভ তথা প্রথমাবধি থেকেই মানুষের মনে একটি প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বারবারই উঠে এসেছে, 'জীবনে কি করা উচিত এবং কি না করা উচিত'। বিভিন্ন ধর্ম, শাস্ত্রগ্রন্থ, প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীগণ, আরও নানান্ ভাবে এই প্রশ্নের সদুত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। কর্মফল, প্রারব্ধ এবং জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ, এমনকি বহু নাস্তিক সমাজবিজ্ঞানী, যাঁরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বীস নন তাঁরাও পুরুষাকারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এর দ্বারাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল প্রকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে। তাঁদের মতে উত্তম কর্ম করণীয় এবং অনুচিত কর্ম বা বিকর্ম বর্জনীয়। তথাপি মূল প্রশ্নটিতো থেকেই যায়, কেননা উত্তম এবং অনুচিত কর্ম আপেক্ষিক। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা এবং ভিন্ন মান ও নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের সংজ্ঞা কী, কিভাবে কর্ম করলে মানষের জীবনের চিরস্থায়ী শান্তি এবং আনন্দ লাভ হয়, কর্মের যথার্থ রহস্য কী?-এই সকল বিষয়গুলির সার্বজনীন, সুস্পষ্ট, উত্তম ব্যাখ্যা অবগত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

গুজরাত নিবাসী শ্রীহীরালাল ভাই ঠক্কর ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন অতি প্রসিদ্ধ মনীষী ছিলেন। তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের উপর অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। আর তিনি তাঁর এই 'Theory of Karma'(কর্মসূত্র/কর্মের সিদ্ধান্ত) নামক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থে শাস্ত্র প্রমাণ এবং সঠিক যুক্তির মাধ্যমে, সাধারণ লোকেদেরও যেন সহজে বোধগম্য হয়, এমন অনেক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রাঞ্জল, মর্ম-স্পর্শী ভাব ও ভাষায় উপরোক্ত মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি শাস্ত্রীয় গ্রন্থাগির উপর ভিত্তি করে ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত, বিকর্ম, প্রারব্ধ ইত্যাদি বিষয়ে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য কী? কি ধরণের কৌশল অবলম্বন করে কর্মাদি করলেও কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে মোক্ষলাভ করা যায়, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্ম কিভাবে যথার্থ কর্মযোগে পরিণত হয়ে থাকে? এই সকল গূঢ় রহস্যপূণ বিষয়গুলি তিনি এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। বস্তুতঃ কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের মধ্যে যে কোনো বিরোধ নেই এবং তদ্রূপভাবে প্রারব্ধ ও পুরুষাকারের মধ্যেও যে কোনো বিরোধ নেই এবং এইগুলি পরস্পর পরিপূরক তা তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে আলোকপাত করেছেন।

শ্রীহীরালাল ভাই ঠক্করের এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম গুজরাতী ভাষায় প্রকাশিত হয়. আর এই অনুবাদ গ্রন্থটি শ্রী সন্তরাম মন্দির, নাড়িয়াড থেকে গুজরাতী ভাষায় প্রকাশিত 'কর্মনো সিদ্ধান্ত' গন্থ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলো। আমি আশা করছি যে,- বাংলা ভাষা-ভাষী বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত জিজ্ঞাসু তথা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের কাছেও এই অনুবাদ গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

এই গ্রন্থটির অনুবাদ এবং প্রকাশনার যাবতীয় কাজে যে তিনজন সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেছি তাঁরা হলেন বিন্ধ্যাচল শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে অবস্থি বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী শরণানন্দ গিরিজি মহারাজ, বোলপুর শান্তিনেকতনে অবস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কেন্দ্রীয়) প্রাক্তন অধ্যাপক মাতৃকৃপা প্রাপ্ত তথা চরণাশ্রিত ডঃ সুনীর কুমার ওঝা এবং কোলকাতা নিবাসী কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ্য কর্মী স্নেহভাজজন শ্রী গৌতম দে মহাশয়। আমি তাঁদের সকলের কাছে ঋণী। তাঁদের সর্বাঙ্গীন কুশলমঙ্গলের জন্য আমি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ স্বরূপিনী শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী শ্রীচরণে প্রার্থনা রাখি। ওঁ শান্তি।

নিবেদক
স্বামী চেতনানন্দ গিরি
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম
পোষ্ট-বিন্ধ্যাচল, জিলা-মির্জাপুর (উঃপ্রঃ)
পিন-২৩১৩০৭
তাং-১লা জানুয়ারী ২০২০

বিষয়-সূচি

শ্রী হীরাভাই ঠক্কর 'কর্ম-সিদ্ধান্তের' উপর যে ৩৫টি প্রবচন (ভাষণ) করেছিলেন-তার সারাংশ

1. 'গহনা কর্মণো গতিঃ।।' (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১৭) ঃ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় শ্রীমুখে বলেছেন যে কর্মের গতি অত্যন্ত গহন অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য, রহস্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের মিত্র শ্রী সুদামাজী কর্মের গহনতা সম্বন্ধে বলেছেন,

"গহন দীখ হৈ কর্ম কী গতি, এক গুরু কে বিদ্যার্থী,
এক হী বৈঠা পৃথ্বিপতি, মেরে ঘর মে খানে অন্ন নহীঁ।
খিলবাড় করতে গোকুল যে মর্কট, গুরু কে ঘর লাতে লকড়ী,
বো আজ বৈঠা সিংহাসন চড়কর, মেরে তুংবড়ী ঔর লকড়ী।"

কর্মের গতি জটিল, কেননা জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। কোন মানুষ দুঃখের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, অপর কেউ সুখে জীবন যাপন করছেন। জীবনে কেন এমন বৈচিত্র? খুবই আশ্চর্য হবার বিষয় হলো অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে ছলকপটকারী, লম্পট, অসৎ উপায়ে উপার্জনকারী, ঘুষখোর ব্যক্তি সুখে সমৃদ্ধে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের নিকট অনেক সম্পদ, মোটরগাড়ী, পাখা, রেডিও, লাখ লাখ টাকা রয়েছে। অথচ ন্যায়-নীতি, সৎ উপার্জন দ্বারা শুদ্ধ পবিত্র, ধার্মিক জীবন কাটাচ্ছেন, এমন অনেক মানুষ অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন। এর কারণ কী? জগতে এমন দৃশ্য দেখে ঈশ্বরের প্রতি কোন কোন ব্যক্তির শ্রদ্ধা ম্লান হয়ে যায়। তাদের মনে প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে যে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে জগৎ পরিচালনায় কোন নিয়ম কানুন কী নেই? ভগবানের বিচার বড় বিলম্বে হয় কেন? ভগবান কি অবিচার করেন? জগৎ কী অন্ধকারের মধ্যে চলছে? ঈশ্বরের সৃষ্টি কী অন্ধকারে পরিপূর্ণ? সাধারণ মানুষের মনে এসব প্রশ্ন

জাগ্রত হওয়া কী অস্বাভাবিক?

কিন্তু বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সৃষ্ট জগৎ অন্ধকার নয় এবং জগতে নিয়ম বর্হির্ভূত কিছু হয়না। ভগবান সদা- সর্বদা সঠিক বিচার করেন। এই বিষয়টি যথার্থরূপে অনুধাবনের জন্য কর্মের নিয়ম কানুন নিজ জীবনে ঠিক মত পালন করার অভ্যাস করা আবশ্যক।

2. কর্মের স্থির সূত্র : বিশ্বের প্রতি রাষ্ট্রে প্রত্যেক বিভাগে কাজ কর্ম সুচারুরূপে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন তৈরি করা হয়ে থাকে। পুলিশ শাখার জন্য পুলিশ মেন্যুয়েল, পি ডবল্যু ডি. শাখার জন্য নিজস্ব মেন্যুয়েল রয়েছে। ন্যায় বিভাগের জন্য ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, রাজস্ব বিভাগের জন্য নিজস্ব নিয়ম কানুন রয়েছে। তদ্রূপ ভাবে ভগবানের সকল প্রকার সৃষ্টি এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চালনের জন্য নিয়ম কানুন রয়েছে। সূর্য নিয়মিত রূপে যথা সময়ে উদয় হয় এবং অস্ত যায়, পৃথিবী- তারকা নিয়মিত গতিতে চলে, বর্ষা ঋতুতে নিয়মিত বর্ষণ হয়। জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে হয়ে থাকে। জগৎ-কর্ত্তা ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট এই সব প্রাকৃতিক নিয়ম কানুনও কর্ম সিদ্ধান্তের অন্তর্গত।

গোস্বামী তুলসী দাস 'রাম চরিত মানস' গ্রন্থে লিখেছেন,

"কর্ম প্রধান বিশ্ব রচি রাখা
জো জস করঈ সো তস ফল চাখা।"

এই সমগ্র বিশ্ব কর্মের নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে, সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এতে সামান্যও অব্যবস্থা নেই।

এই কর্ম সিদ্ধান্তের এক মঙ্গলময় বিশেষত্ব রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে যত জাগতিক নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলির মধ্যে ব্যতিক্রম (exception to the rule and Provision) ও রয়েছে। কিন্তু কর্মের নিয়ম নীতিতে কোন

স্থানে সামান্যও ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নেই। রাজা দশরথ স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পিতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কর্মের নিয়ম অনুসারে পুত্রশোকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। স্বয়ং ভগবান এমন বলেননি এবং করেননি যে 'রাজা দশরথ আমার পিতা, তাই কর্মের সিদ্ধান্তকে সামান্য পরিবর্ত্তন করে নিয়মের ব্যতিক্রম রূপে তাঁর আয়ুষ্কাল চৌদ্দ বছর বৃদ্ধি করে দেওয়া যাক্, নির্গুণ নিরাকার, শুদ্ধ ব্রহ্মও যখন সগুণ, সাকার সর্বশক্তিমান রূপে ধরাধামে অবতার গ্রহণ করেন তখন তাঁকেও কর্মের নির্দ্দিষ্ট, স্থির এই সকল নিয়ম কানুনগুলি পালন করে চলতে হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে কর্মের ফল প্রদানে এবং ভগবানের বিচারে কোন বিলম্ব হয়না এবং কোনরূপ ত্রুটিও থাকে না, কোনরূপ অন্ধকারের সুযোগ নেই, সুস্পষ্টরূপে নিয়ম কানুন অবলম্বন ও অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তাতে সামান্যও পরিবর্ত্তন হয়না, সুপারিশ চলে না, কোন ব্যতিক্রম হয়না। এই হলো এই নিয়ম কানুনের বিশেষত্ব। এখন কর্মের সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ নিয়ম কানুন) বিস্তৃতরূপে নিম্নে বর্ণিত হলো।

3. কর্ম কাকে বলে? : সহজ সরল ভাষায়, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে কর্ম মানে কাজ, ক্রিয়া (action), আহার, স্নান, দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা, চলাচল করা, চাকুরী বা ব্যবসা করা, কিছু চিন্তা করা বা চিন্তা না করা, নিদ্রা বা অনিদ্রা, দেখাশুনা করা বা দেখা শুনা না করা, সুগন্ধ গ্রহণ করা বা না করা, স্পর্শ করা বা না করা, কথা বলা বা মৌন থাকা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, জন্ম-মৃত্যু .... ইত্যাদি যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া (action) কে কর্ম বলা হয়ে থাকে। এই সকল কর্মের তিন প্রকার ভাগ রয়েছে। যথা— (ক) ক্রিয়মাণ কর্ম (খ) সঞ্চিত কর্ম এবং (গ) প্রারব্ধ কর্ম।

4. ক্রিয়মাণ কর্ম : মানুষ প্রাতঃকালে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল কর্ম করে থাকে তা হলো ক্রিয়মাণ কর্ম। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত, মাসের প্রথম তারিখ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত, প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্যন্ত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ সারা জীবনে যে যে কর্ম করে থাকেন, সব কর্মই ক্রিয়মাণ কর্ম।

এই যে উল্লিখিত ক্রিয়মাণ কর্ম তা ফল প্রদান করার পরেই শান্ত হয়ে যায়, ফল প্রদান না করে কদাপিও শান্ত হয়না। ক্রিয়মাণ কর্মের ফল ভোগ করার পরেই সেই কর্মফল সমাপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ধরুন আপনার জল-তৃষ্ণা পেয়েছে, আপনি জল পান করলেন। আপনি এই যে জল পানরূপ কর্ম করলেন তাতে আপনার পিপাসা মিটে গেল। কর্ম ফল দিয়ে শান্ত হয়ে গেল। আপনি ভোজন করলেন, তাতে আহার রূপ কর্ম করায় আপনার ক্ষুধা নিবৃত্ত হলো, কর্ম তার ফল দিয়ে শান্ত হয়ে গেল। ধরুন আপনি কাউকে কটুবচন বললেন, সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে থাপ্পড় মারলেন, কর্ম ফল দিয়ে শান্ত হয়ে গেল। আপনি স্নান করলেন, স্নান করা কর্ম দ্বারা আপনার শরীর শুদ্ধ হয়ে গেল, কর্ম ফল দিয়েই শান্ত হয়ে গেল। এরূপ ভাবে অসংখ্য ক্রিয়মাণ কর্ম করার পরে সেই কর্ম ফল দিয়ে শান্ত হয়ে যায়।

5. সঞ্চিত কর্ম : কিন্তু কোন কোন ক্রিয়মাণ কর্ম এরূপ হয়ে থাকে যে কর্ম করার সাথে সাথেই, তৎক্ষণাৎই ফল প্রদান করেনা। সেই ফল বিলম্বে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, কর্মফল পরিপক্কতার জন্য অধিক সময় লেগে যায়। আর যে সময় পর্যন্ত সেই কর্মফল অপরিপক্ক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফল দিতে পারেনা, কিন্তু সেই ফল জমা বা সঞ্চিত থাকে। এরূপ কর্মকে বলা হয় সঞ্চিত কর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আজ হয়ত কোন

বিদ্যার্থী পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের জবাব লিখলো, কয়েক মাস পরে এর ফল বের হবে। কেহ হয়ত পেট পরিস্কারের জন্য জুলাপের ঔষধ গ্রহণ করলেন। তাকে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে পেট পরিস্কারের জন্য। কোন ব্যক্তি হয়ত আজ কাউকে খুব গালি গালাজ করলো, হয়ত দশ দিন পরে সুযোগ পেয়ে ঐ লোকটি প্রতিশোধ নেবার জন্য আঘাত করলো বা কোন ক্ষতিকারক কার্য করলো। তাতে তার কর্মের ফল প্রাপ্ত হলো। কর্ম তার কর্ম-ফল দিয়ে শান্ত হলো। কেহ হয়ত তার যৌবন কালে মাতা পিতার মনে দুঃখ দিল, সেই ফল তখন সঞ্চিত হয়ে রইলো, আর বৃদ্ধাবস্থায় তার পুত্র হয়ত তাকে দুঃখ দিবে। কেহ হয়ত এই জন্মে মহান সঙ্গীতজ্ঞ হবার ইচ্ছায় খুব পুরুষার্থ প্রয়োগ করলো, কিন্তু হয়ত পূর্ণ সফলতা লাভের পূর্বেই তার মৃত্যু হলো, পরবর্তী জন্মে হয়ত সে বাল্যাবস্থা থেকে একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠলো।

এরূপ ভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম অনেক সময়ে তৎক্ষণাৎ বা অবিলম্বে ফল দিতে পারেনা, কিন্তু যখন কর্মফল পরিপক্ক হয়ে উঠে, তখন সেই কর্ম, ফল দিয়ে থাকে। ততক্ষণ পর্যন্ত তা সঞ্চিত কর্ম রূপে জমা হয়ে থাকে। বজরা বা ধান ১০ দিনে পাকেনা, তা পাকতে প্রায় ৯০ দিন লাগে, গম প্রায় ১২০ দিনে পাকে। আমের চারাগাছ রোপনের পরে প্রায় ৫ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ফল প্রাপ্তির জন্য। কোন বৃক্ষের ফল ১০ বছর পরে হয়ে থাকে। ক্রিয়মাণ কর্মের বীজ যেরূপ হয়, তার ফল প্রদানের সময়ও তদ্রূপ হয়ে থাকে। কোন ক্রিয়মাণ কর্মের ফল শীঘ্রলাভ হয়, আবার কোন ক্রিয়মাণ কর্মের ফল পেতে বিলম্ব হয়।

অনেক সঞ্চিত কর্মের ফল জীবের পিছনে অনুসরণ করে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আজ সারাদিনে হয়ত কোন ব্যক্তি ১,০০০ ক্রিয়মাণ কর্ম করলেন। তন্মধ্যে হয়ত ১০০ ক্রিয়মাণ কর্ম এমন

যে তা তৎক্ষণাৎ ফল দিয়ে সমাপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু হয়ত বাকী ৯০০ কর্ম এমন যে যেগুলির কর্মফল পরিপক্ক হতে দীর্ঘ সময় লাগবে, তাই ফল দিতে বিলম্ব হবে। সুতরাং এই কর্মগুলি সঞ্চিত কর্ম রূপে জমা হয়ে থাকবে। মনে করুন এরূপে আজ ১০০ কর্ম সঞ্চিত হলো, আগামী কাল দ্বিতীয় দিনে হয়ত ১২৫ কর্ম সঞ্চিত হলো, তৃতীয় দিনে হয়ত এগুলির মধ্যে ৭৫ কর্ম ফল দেবার জন্য পরিপক্ক হয়ে গেল, আর ফল প্রদান করে কর্মফল শান্ত ও সমাপ্ত হয়ে গেল। চতুর্থ দিনে হয়ত ৮০ কর্ম সঞ্চিত রূপে জমা হয়ে রইলো। এইরূপে হয়ত এক সপ্তাহে ৩০০ কর্ম, একমাসে হয়ত ১২০০ কর্ম, এক বছরে হয়ত প্রায় চৌদ্দ-পনের হাজার কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়ে গেল। তাতে সারা জীবনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হয়ত আট লাখ কর্ম সঞ্চিত হয়ে গেল। তাহলে অনাদি কাল থেকে অনেক জন্মের অসংখ্য সঞ্চিত কর্ম একত্র হয়ে কোটি কোটি হিমালয় সম হয়ে যাবে। আর সেই সঞ্চিত কর্মের স্তূপ কর্মফল প্রদানের অপেক্ষায় জীবের পিছনে জমা হয়ে পড়ে থাকবে। এই সকল সঞ্চিত কর্ম বর্তমান জন্মে এবং পরবর্তী অনেক জন্মে যখনই পরিপক্ক হয়ে যাবে তখনই ভোগ এবং ফল প্রদান করে তা সমাপ্ত বা শান্ত হবে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি সাবধানতার সঙ্গে, গভীরভাবে এই চরম সত্য বিষয়টি অনুধাবন করেন তাহলে তিনি হয়ত আঁত্‌কে উঠবেন, তার হৃদয় তখন কেঁপে উঠবে। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত জীব তা কখনও কল্পনা করতে পারেন না।

রাজা দশরথ ঋষিপুত্র শ্রবণ কে না জেনে বধ করেছিলেন। শ্রবণের শোকার্ত মাতা-পিতা রাজা দশরথকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার মৃত্যুও পুত্রশোকে হবে।" কিন্তু রাজার ক্রিয়মাণ কর্ম তৎক্ষণাৎ ফল দিতে পারেনি, কেননা ঐ সময় রাজা দশরথের কোন পুত্র ছিল না। তাই ঐ ক্রিয়মাণ কর্ম তৎক্ষণাৎ ফল দিয়ে শান্ত বা সমাপ্ত হওয়ার ছিলনা।

কিন্তু ঐ কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়ে গিয়েছিল। কালে রাজা দশরথের এক নয়, চার পুত্র লাভ হলো। পুত্রদের বয়স বৃদ্ধি হলো, সকলের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো এবং শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত হলো। ঐ সময় তাঁর সঞ্চিত কর্ম, ফল দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। আর এরূপ সুদিন, শুভ সময় এলেও রাজা দশরথের মৃত্যুরূপী ফল পরিপক্ক হয়ে গেল, সেই কর্ম ফল দিয়ে তা সমাপ্ত বা শান্ত হলো। তাতে সামান্যও বিলম্ব হয়নি। শ্রীরাম স্বয়ং মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়েও নিজের পিতার জীবনের আয়ুষ্কাল চৌদ্দ বছর বৃদ্ধি করেননি, কালের প্রভাব রূপ নিয়মকে উলঙ্ঘন করেননি, তিনি কোন সুপারিশ বা চেষ্টা করেননি। শ্রীরাম শুদ্ধ চৈতন্য, পরাৎপর ব্রহ্ম, স্বয়ং সগুণ, সাকার ভগবান রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই শ্রীরাম যাঁর শ্রীচরণ কমলের রজ স্পর্শে মাত্র পাথররূপী অহল্যা জীবন লাভ করে মুক্তিলাভ করেছিলেন, সেই স্বয়ং শ্রীরাম যদি পিতার আয়ুষ্কাল মাত্র চৌদ্দ বৎসর বৃদ্ধি করে দিতেন তাহলে তাতে কারো বাধা দেবার বা বিরোধ করার ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু কর্মের সিদ্ধান্ত উলঙ্ঘন করে ভগবান কোন শক্তি প্রয়োগ বা চেষ্টা করেননি। সুতরাং "ঈশ্বরের ঘর অর্থাৎ এই জগত, অন্ধকার অর্থাৎ নিয়ম হীন, এখানে কর্মফল ভোগ করতে হয়না," এইসব কথা মোটেই সত্য নয়। ভগবান চুঁলচেড়া বিচার করেন। প্রতিটি কর্মের ফল আছে, কর্ম-ফল বিলম্বে নয়, যথা সময়ে লাভ হয়। এই পরম সত্য, এইই কর্মের স্থির সিদ্ধান্ত বা সূত্র।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একসঙ্গে ১০০ পুত্রের মৃত্যু হলো। তখন শোকার্ত রাজা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার এই জীবনে এমন কোন ভয়ঙ্কর পাপ করিনি যার ফল-স্বরূপ একসঙ্গে আমার শত পুত্রের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে।" তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার পূর্ববর্ত্তী ৫১ জন্ম

স্বচক্ষে দেখার দৃষ্টি শক্তি প্রদান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র দেখতে পেলেন পঞ্চাশের পূর্ব জন্মটিতে তিনি একজন ব্যাধ ছিলেন, আর একদিন তিনি একটি বৃক্ষের উপরে বসা অনেক পাখিকে ধরবার উদ্দেশ্যে শূলযুক্ত লোহার জাল ঐ বৃক্ষে বিছিয়ে বৃক্ষের নীচে অগ্নি প্রজ্বলিত করে দিয়েছিলেন। সেই আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু পাখি উড়তে শুরু করলে গরম জালের স্পর্শে অন্ধ হয়ে গেল, আর বাকী ১০০টি ছোট পাখি ঐ জালের মধ্যে ভস্ম হয়ে গেল।

ধৃতরাষ্ট্রের ঐ ক্রিয়মাণ কর্ম, ফল দেবার জন্য ৫০ জন্ম পর্যন্ত সঞ্চিত কর্ম হিসাবে অপেক্ষা করছিল। পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ঐ কর্ম, ফল দিতে পারেনি। ঐ ব্যাধ তার পরবর্ত্তী জন্মগুলিতে অনেক পুণ্য-কর্ম করার ফল-স্বরূপ এই জন্মে ধৃতরাষ্ট্র হয়েছিলেন রাজা। তিনি এমন অনেক পুণ্য করেছিলেন যার ফল-স্বরূপ ১০০ পুত্র লাভ করলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে, এই জন্মে তার সঞ্চিত কর্ম ফল দেবার জন্য তৎপর হলো এবং তাকে অন্ধ হতে হলো, ১০০ পুত্রের একসাথে মৃত্যুও হলো। কী অদ্ভুত কর্ম সিদ্ধান্ত, কর্ম রহস্য! ৫০ জন্ম পর্যন্ত ঐ ব্যাধের ক্রিয়মাণ কর্ম তাকে অনুসরণ করলো, কর্মফল দেবার জন্য। ১০০ পুত্র প্রাপ্তি হয়, এতবড় পুণ্য করার পরেও ঐ কর্ম সঞ্চিত অবস্থায় অপেক্ষা করে বসে ছিল। সঠিক সময় আসা মাত্র তৎক্ষণাৎ, সামান্য বিলম্ব না করে ফল প্রদান করে কর্মফল সমাপ্ত এবং শান্ত হলো। তাই যথার্থ বচন এই যে "খুদার গৃহ অন্ধকার নয় এবং তাঁর বিচার বিলম্বে হয় না।"

অপর একটি উদাহরণ দ্বারা ক্রিয়মাণ এবং সঞ্চিত কর্মের বিষয়টি বুঝানো যেতে পারে। ধরুন কোন ব্যক্তিকে আপনি পাঁচশো টাকা ঋণ দিলেন, উপযুক্ত প্রমাণ, কাগজ আপনার নিকট রয়েছে। কিন্তু পরে সেই ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করলো। তখন আপনি দেওয়ানী

আদালতের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করাতে পারেন, যাতে সে ঐ অর্থ আপনাকে পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতার কাছে যদি কোন অর্থ না থাকে, তা যদি সে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে সেই ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে সেই ব্যক্তির নিকট থেকে আপনি সেই সময় অর্থ ফেরৎ পাবেন না, আইনগত ভাবে তার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ঋণ-গ্রহীতা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছেন এবং অনেক অর্থ উপার্জন শুরু করেছেন, তাহলে তখন আদালতের জারীকৃত ঐ ওয়ারেন্ট অবিলম্বে কার্যকরী হবে এবং সে আপনার ঋণের অর্থ ফেরৎ দিতে বাধ্য হবে, সেই ওয়ারেন্ট তখন কার্যকরী হবেই। তদ্রূপ ভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম, সঞ্চিত কর্ম রূপে জমা হয়ে থাকবে, ভবিষ্যতে সুযোগ আসা মাত্র তা পরিপক্ক হয়ে ফল প্রদান করে তবেই তা সমাপ্ত এবং শান্ত হবে।

এমনি ভাবে যে ক্রিয়মাণ কর্ম ফল না দিয়ে শান্ত এবং সমাপ্ত হয়না তাকে সঞ্চিত কর্ম বলা হয়।

6. প্রারব্ধ কর্ম : অনেকগুলি সঞ্চিত কর্ম একত্র হয়ে ফল দেবার জন্য যখন উন্মুখ হয় তখন তাকে প্রারব্ধ কর্ম বলা হয়।

অনাদি কাল থেকে জীবের অনেক জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম রয়েছে যা হয়ত কোটি হিমালয় পর্বত ভরে যাবে, সেই বিশাল পরিমাণ কর্ম ফল দেবার অপেক্ষায় মানুষের জীবনের পিছনে জমা হয়ে আছে। আর এগুলির মধ্যে যে সকল সঞ্চিত কর্ম ফল দেবার জন্য পরিপক্ক হয়ে গেছে, সেই প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য তদ্ অনুসারে জীবের শরীর ধারণ হয়ে থাকে। নির্দ্দিষ্ট প্রারব্ধগুলি, নির্দ্দিষ্ট শরীর দ্বারা ভোগ করার পরে সেই দেহের পতন হয় অর্থাৎ শরীরের মৃত্যু হয়, শরীরের ক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়। প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করার জন্য সেই অনুসারে দেহ, আরোগ্য, স্ত্রী পুত্রাদি,

সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সেই জীবন কালে জীবের নিকট উপস্থিত হয়ে থাকে। ঐ প্রারব্ধ কর্ম সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা ব্যতীত দেহ থেকে মুক্তি লাভ হয়না।

বৃদ্ধাবস্থায় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দশ বছর শয্যাশায়ী থাকলে শরীরে পচা দুর্গন্ধ হয়। তখন সেই বৃদ্ধ হয়ত বলেন, "হে ভগবান, কবে আমার মৃত্যু হবে?" এইরূপে অনেকবার বক্‌বক্ প্রলাপ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রারব্ধকর্ম ভোগ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেহের মৃত্যু হবে না। আর প্রারব্ধ কর্ম ভোগের দ্বারা সমাপ্ত হবার পরে বৃদ্ধের পুত্র যদি মৃত শরীরের মুখে জল দেয়, সেই জল নাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে, একফোটা জল ভিতরে যাবে না এবং একবার মাত্র শ্বাস গ্রহণ করে সে দাঁড়াতে পারবে না। বৃদ্ধের শরীর পাত হলেও ঐ জীবাত্মার অন্যান্য সঞ্চিত কর্ম পরিপক্ক হয়ে ফল দেবার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। আর সেই প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য অনুরূপ পরবর্ত্তী নিদ্দিষ্ট দেহ পুনঃ ধারণ করতে হবে। আর সেই অনুসারে তার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদি লাভ হবে। জীবিত কালে যাবতীয় প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করার পরেই শরীর ত্যাগ হবে। এমনিভাবে জীব বারবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করছে। আর অনাদি কাল থেকে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের জমে থাকা সঞ্চিত কর্ম পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধরূপে প্রস্তুত হয়ে যায়। এরূপ ভাবে জীব অনন্ত কাল পর্যন্ত পৃথক পৃথক দেহ ধারণ করে চলেছে। আর যতকাল পর্যন্ত দেহ ধারণ করার হেতু বা কারণ সমাপ্ত না হচ্ছে, তত সময় পর্যন্তই তার মোক্ষ লাভ সম্ভব হয় না। তাই স্বামী শংকরাচার্য্য বলেন,

"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননি জঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া অপারে পাহি মুরারে।"

জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে অনেক যোনিতে ভ্রমণ করে চলেছে এবং

নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম করছে। আর এগুলির মধ্যে অনেক কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়ে থাকছে, আর তা পরিপক্ক হয়ে ফল দেবার জন্য প্রারব্ধরূপে জীবের সামনে উপস্থিত হচ্ছে এবং তা ভোগ করতে হচ্ছে। অনন্তকাল ধরে জীবের এই করুণ অবস্থা। তাই বলা হয়ে থাকে সংসার সাগর, তা অতিক্রম করা দুস্তর, সুকঠিন। তাহলে জীবের মোক্ষ লাভ কিরূপে সম্ভব?

7. যে কর্ম করা হয়েছে, তার ফল ভোগ করতেই হবে :

কোন কর্ম করা হলে সে কর্মের ফল কর্ম-কর্ত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। তারপর ফল ভোগ না করার জন্য আপনি যতই না ছুটাছুটি করুন, তথাপি ফল না দিয়ে কর্ম শান্ত হবে না। আপনার পিছনে ঘুরছে কর্ম তার ফল দেবার জন্য। আর ভোগ হয়ে গেলেই কর্ম-ফল থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছেন। মনে করুন আপনি একজন বুদ্ধিমান এবং চতুর লোক, আপনি কোন অপরাধ করেছেন, আর বিশ্বের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উকিলের পরামর্শ এবং সাহায্য নিয়ে আদালতের সাজা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন। কিন্তু উপরের যে সুপ্রীম কোর্ট অর্থাৎ ভগবানের বিচার তা আপনাকে ছাড়বেনা, ধরে ফেলবেই। সেখানে কোন উকিলের সুপারিশ বা সাহায্য কাজে আসবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক বছর পূর্বের কথা। গুজরাটের অহমদাবাদ শহরে একজন তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, প্রসিদ্ধ সেশন্স জজ চাকুরী রত ছিলেন। তিনি নাগর ব্রাহ্মণ জাতির ছিলেন, কট্টর বেদান্তী ছিলেন। কর্মের সিদ্ধান্ত, নিয়মাদি সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। সাবরমতী নদীর পাশেই তিনি বাস করতেন।

একদিন প্রাতঃকাল ব্রাহ্মমুহূর্তে আবছা অন্ধকারের মধ্যে তিনি নদীর পাড়ে মলত্যাগের জন্য বসেছেন, তখন দেখতে পেলেন তাঁর পাশ দিয়ে একটি লোক প্রাণপণে দ্রুত দৌড়াচ্ছে, পিছনে অপর একটি লোক হাতে

ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাকে অনুসরণ করছে। ঐ সেশন্স জজের সন্মুখেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তিকে ঐ অস্ত্র দ্বারা পিঠের উপর প্রচন্ড জোরে আঘাত করায় আহত ব্যক্তিটি সেখানে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হলো। সেশন্স জজ মহাশয় ঐ দৃশ্য কাছে থেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর তিনি দেখলেন যে খুনী সেস্থান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। জজ মহাশয় খুনীর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখে নিলেন।

জজ সাহেব নিজ গৃহে ফিরে এই বিষয়ে কাউকে কিছু বলেননি। কারণ তিনি জানতেন যে এটি খুনের কেস বলে তা তারই কোর্টে-বিচারের জন্য আসবে। তাই হলো। পুলিশ তদন্ত করতে ছয় মাস সময় নিল। কোর্টে পুলিশ-রিপোর্ট জমা হলো। সেশন্স জজ দেখতে পেলেন যে বাস্তবিক যে ব্যক্তিটি খুনী ছিল, যার চেহারা জজ সাহেব নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিকটে উপস্থিত থেকে, তার বদলে পুলিশ অন্য এক ব্যক্তিকে (চেহারার সঙ্গে ঐ খুনীর চেহারার মিল ছিল) অপরাধী হিসাবে কোর্টে হাজির করলো।

তারপর কেস চলতে শুরু হলো। সঠিক তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে ঐ ব্যক্তিই খুনী। সেশন্স জজ ভাল ভাবেই জানতেন যে আসল খুনী এই ব্যক্তি নয়। কিন্তু বিধি ও আইনের দৃষ্টিতে এই ব্যক্তি দোষী বলে প্রমাণিত হওয়ায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাকেই ফাঁসীর সাজা দিতে বিচারক বাধ্য ছিলেন। কিন্তু সেই বিচারক একজন কট্টর বেদান্তী ছিলেন, ঈশ্বরের তৈরি কর্মের বিধি-বিধান সম্বন্ধে তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সত্যিকারের খুনী দণ্ড পায়নি, এক নির্দোষ ব্যক্তির সাজা হতে যাচ্ছে। আর তাই বিচারক রায় দেবার পূর্বে ঐ নির্দোষ অথচ দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গোপনে তাঁর চেম্বারে ডেকে নিলেন।

দন্ড পেতে যাচ্ছে, সেই নির্দোষ ব্যক্তিটি বিচারকের সামনে কেঁদে

কেঁদে করুণ স্বরে বলল, "আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আসল খুনীকে পুলিশ ধরতে পারেনি বলে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে এবং প্রমাণ করেছে যে আমি খুনী। বস্তুতঃ আমি খুনী নই।"

তখন সেশন্স জজ মহাশয় বললেন, "এই বিষয় আমি ভাল ভাবেই জানি। আসল খুনীকে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তুমি যে নির্দোষ, তা আমি ভাল ভাবেই জানি। কিন্তু আমার বিচারের মধ্যে আইনগত ভাবে তা আমি আনতে পারছিনা। আইন, নিয়ম কানুন প্রমাণের দ্বারা উপস্থাপন হয়ে থাকে। প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে তোমার বিরুদ্ধে রয়েছে। আইনের বিধি-বিধান অনুসারে তোমাকে ফাঁসীর সাজা নিতেই হবে। কিন্তু ঈশ্বরের বিধি-বিধান ও কর্ম-সূত্রের মধ্যে কোন ভুল হয়না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান, পরীক্ষা এবং স্থির সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি এর সঠিক উত্তর দিবে। তোমার মৃত্যু সন্নিকটে, এসময় তুমি মিথ্যা কথা বলোনা। আমার প্রশ্ন হলো অতীতে তুমি কোন ব্যক্তিকে খুন করেছো কিনা?"

নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও দোষী প্রমাণিত ঐ ব্যক্তি গদ্‌গদ্ স্বরে ভগবানকে সাক্ষী রেখে সত্য কথা বলে দিল। সে বলল, "আমি অতীতে দু'টি খুন করেছি। সেজন্য কোর্টে বিচার চলছিল। কিন্তু তখন প্রসিদ্ধ উকিলের সহায়তায় এবং পুলিশ বিভাগকে ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট করে ঐ দু'টি মোকদ্দমাতেই নির্দোষ রূপে রেহাই পেয়েছিলাম। কিন্তু এই মোকদ্দমাতে আমি পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সাজা দেওয়া হচ্ছে।"

সেশন্স জজ সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে ঈশ্বরের বিচারে কোন ভুল হয় না। প্রথমে দু'টি খুন করার পর ঐ ব্যক্তির পূর্বকৃত পুণ্য এবং তপস্যার শক্তিতে তার ক্রিয়মাণ কর্মের ফল পেতে দেরী হলো এবং ঐ কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা ছিল। যখন তার সঞ্চিত পূণ্য সমাপ্ত হয়ে গেল

তখন পূর্বে সে যে দু'টি খুন করেছিল তার ফল পরিপক্ক হওয়ায় এই মোকদ্দমায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও প্রারব্ধ ফল দিতে তার সন্মুখে এসে গেল। ফলে তাকে ফাঁসীর মঞ্চে চড়াতে হলো।

কর্মের সিদ্ধান্তে (বিধি-বিধানে) ভগবানের নিকট জজ, বিচারক, প্রসিদ্ধ উকিলের বিদ্বৎবত্তা, যোগ্যতা অথবা তাদের কোন সুপারিশই কাজে আসবেনা। কিন্তু পূর্বের পূণ্য জমা থাকলে অথবা ক্রিয়মাণ কর্ম পরিপক্ক হতে বিলম্ব থাকলে সে সময় জাগতিক দৃষ্টিতে পাপী, অপরাধী ব্যক্তি যেন নির্দোষ এবং সুখী মানুষ রূপে সাধারণ লোকের নিকট প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু যখন সঞ্চিত কর্ম পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধ রূপে সন্মুখে উপস্থিত হবে, তৎক্ষণাৎ তা ফল দিয়ে শান্ত এবং সমাপ্ত হয়ে যাবে।

সুতরাং কর্ম করার পূর্বে হাজার বার বিচার করা উচিত। আর কর্ম করার পরে কর্মফল থেকে পরিত্রাণের জন্য নিরর্থক, বৃথা প্রযত্ন করা উচিত নয়। বরং যখন ঐ কর্ম পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধরূপে ফল দেবার জন্য উপস্থিত হয় তখন বুক ফুলিয়ে, প্রসন্নতার সাথে তা ভোগ করা কর্ত্তব্য। অন্যথায় হাসতে হাসতে করা পাপের ফল কাঁদতে কাঁদতে ভোগ করতেই হবে।

রাজা পরীক্ষিত মহাজ্ঞানী, বিদ্বান এবং শুভ সংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি একটি ঘোর পাপ কাজ করেছিলেন, ক্রোধের বশে এক নির্দোষ, নিরাপরাধী ঋষির গলায় একটি মৃত সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা গৃহে ফিরে শান্ত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তাঁর দুষ্কর্মের কথা বুঝতে পেরে, তা স্মরণ করে বলে উঠেন,

"অহো ময়া নীচমনার্যবৎ কৃতং। নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১-১১-১)

অর্থাৎ "ওহে, আমি এক নিরপরাধী ব্রাহ্মণের সাথে অতীব নীচ ও অধর্ম

ও অন্যায় কাজ করেছি। এই ক্রিয়মাণ কর্মের পরিণাম স্বরূপ আমার পাপনাশের জন্য শীঘ্র আমার শাস্তি হোক, তাহলে এই দৃষ্টান্ত দেখে অন্য কোন রাজা এরূপ নীচ কর্ম করবেনা।

"ধ্রুবং ততো যে কৃতদেবহেলতাৎ দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ।
তদস্তু কামং ত্বদ্যনিষ্কৃতায় মে যথা ন কুর্যাম্ পুনরেবমদ্ধা।
অদৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোশং প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে।
দহতু অভদ্রস্য পুনর্নমেহভূৎ পাপীয়সী ধীর্দ্বিজদেবগোভ্যঃ।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১১।২-৩)

অর্থাৎ "শাস্তি স্বরূপ এই ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে আমার সম্পূর্ণ রাজ্য, বল, সমৃদ্ধি, কোষাগার, ভান্ডার-গৃহ সব কিছু এখনই অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যাক্, যাতে ব্রাহ্মণ, দেবতা, গো প্রভৃতির প্রতি এরূপ দুর্বুদ্ধি আর উৎপন্ন হতে না পারে।"

রাজা পরীক্ষিতের ক্রিয়মাণ কর্ম প্রারব্ধ রূপে সন্মুখে উপস্থিত হলে তিনি তা সানন্দে ভোগ করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর মোক্ষ প্রাপ্তিও হয়েছিল। কর্ম-ফল থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি কারো সুপারিশ গ্রহণ করেননি, যদি গ্রহণ করতেন তবুও কর্মফল সহ্য করা ছাড়া তা নাশ হতোনা।

8. 'ধর্মের ঘর ঢাকা (অর্থাৎ আবরিত), অধর্মের গৃহে সমৃদ্ধি', তা কেন হয়? : কর্মের স্থির সিদ্ধান্ত হলো যেমন বীজ বপন তেমন ফল প্রাপ্তি'। অর্থাৎ 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' 'যেমন করা তেমন ভরা। জো জস করই, সো তস ফল চাখা'। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে এর বিপরীত দেখা যায় কেন? আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করছি, স্বচক্ষে দেখছি, যে ব্যক্তি ন্যায়, নীতি এবং ধর্মীয় জীবন অনুসরণ করে চলছেন তাঁর অনেক দুঃখ-কষ্ট

সহ্য করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে যারা অধর্ম, অনীতির আশ্রয় নিয়ে কালোবাজারী, ঘুষ গ্রহণ এবং অন্যান্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করছে তারা গাড়ী, বাড়ী, প্রচুর ধন সম্পদ এবং প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করছে। তারা পাপ কর্ম করেও কেন এসব বৈষয়িক সুখ লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে? এসব দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষ ভগবানের উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস কি করে স্থির রাখতে পারেন? তারা হয়ত মনে করতে পারেন ভগবানের কর্ম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ছল কপট রয়েছে কি? তখন এরূপ সংশয়যুক্ত কোন কোন মানুষ সুখ লাভের আশায় ভ্রান্তি বশতঃ অবৈধ, অনীতি এবং অধার্মিক উপায়ে ধন প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করে থাকে। আসলে নিঃসন্দেহে এ হলো এক প্রকারের ভয়ংকর মূর্খতা। কেননা বস্তুতঃ পূণ্যের ফল সর্বদাই সুখ এবং শান্তি, আর পাপের ফল সর্বদাই দুঃখ এবং অশান্তি।

পাপ করেও সুখ ভোগ করে এমন দৃশ্যতো দেখা যায়। আসলে এর কারণ হলো বর্তমানের এই যে সুখ তা বর্তমান পাপের ফল নয়, পূর্বে করা পূণ্যের ফল। সেই ব্যক্তি পূর্বে যে পূণ্য করেছিল সেই কর্মফল সঞ্চিত রূপে জমা ছিল। বর্তমানে তা পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধরূপে তাকে সুখ দিচ্ছে। আর বর্তমান সময়ে সেই ব্যক্তি যে পাপ করছে তা ফল দিতে বিলম্ব হচ্ছে মাত্র। যখন তার পূর্ব পুণ্য কর্মের প্রারব্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ তার পাপ কর্মের পরিপক্ক-ফল তার সন্মুখে প্রারব্ধ রূপে উপস্থিত হয়ে দুঃখ প্রদান করবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্বের পূন্যফল ভোগ করছে, ততক্ষণ বর্তমান সময়ে করা পাপ কর্মের দুঃখ দায়ক ফল তাকে আক্রমণ করবেনা। এই প্রসঙ্গে সন্ত কবীরের গানটি উল্লেখযোগ্য।

"পূণ্য পূর্ব কে জমা অভী, সুঝতে হে তুফান,
কিন্তু বহ খর্চী খুটতে হী, আগে খড়া হে কঠিন মৈদান।

জীব মান মান রে মান, অভী ভী ক্যাঁউ নহীঁ আয়ী সান

কবীরা তেরা পুণ্য কা জব তক হে ভাণ্ডার, তব তক অবগুন মাফ হে করো গুনহ্ হাজার।।”

ন্যায় নীতি অবলম্বন করে চলা সত্ত্বেও কোন কোন ব্যক্তি যখন দুঃখ ভোগ করে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে বর্তমান সময়ের এই দুঃখ পূর্বের কোন পাপ কর্মের ফল, যা সঞ্চিত কর্মফল রূপে জমা ছিল, যা বর্তমানে পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধ রূপে সন্মুখে উপস্থিত হয়েছে। আর এর পরিণাম বা ফলস্বরূপ তাকে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ন্যায়-নীতি ও বৈধ উপায় অবলম্বন করে যে শুভকর্ম করা হচ্ছে, তা যথাসময়ে পরিপক্ক হয়ে সুখদায়ী, সুখ-স্বরূপ প্রারব্ধ রূপে তাঁর সন্মুখে অবশ্যই উপস্থিত হবে। তাই কর্মের সিদ্ধান্তের (বিধি-বিধানের) প্রতি অবশ্য-শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত। আর তা না করে অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করে, বিধি-বিধান উলঙ্ঘন করে, অনীতি পূর্বক, অশাস্ত্রীয় কর্ম করলে অনর্থ, দুঃখ কষ্ট প্রাপ্ত হবেই। তাই এরূপ পাপাচরণ থেকে বিরত হওয়া উচিত।

একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে কারো বাড়ীতে অন্ন যথা = ধান, গম চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখার জন্য মাটির দ্বারা তৈরি কোন বড় পাত্র প্রস্তুত করা হয়। ঐ পাত্রের মধ্যে চাল, গম ইত্যাদি ঢেলে দিয়ে পাত্রের মুখটি ভাল ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর পাত্রের নীচে একটি ছিঁদ্র করে রাখা হয় আবশ্যকতা অনুসারে সহজে তা বের করার জন্য। মনে করুন আপনি ঐ পাত্রের মধ্যে গম ভরে রেখেছেন। আর আমি আমার পাত্রে কোন্দো (এক প্রকারের খাদ্য শস্য) ভরে রেখেছি। তারপর আপনি আপনার গম ভর্তি পাত্রে কোন্দো ভরে দিলেন। এবার উভয় পাত্রের নীচের ছিদ্র খুলে দেওয়া হলো। তখন কি

দেখা যাবে? দেখা যাবে যে আমার পাত্রের মধ্যে ভরা কোন্দো যতক্ষণ পর্যন্ত নীচের ছিদ্র দ্বারা বের হয়ে সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গম বের না হয়ে কোন্দোই বের হবে। কিন্তু আমার বিচলিত হবার আবশ্যকতা নেই। তদ্রূপ ভাবে আপনার বেলায়ও তা প্রযোজ্য। আপনার পাত্রে গম প্রথমে বের হওয়া শেষ হলে তারপর কোন্দো বের হবেই। তখন আপনার কোন্দো খাবার সময় এসে যাবে। ইহাও নিশ্চিত যে আমার পাত্রে প্রথমে কোন্দো সঞ্চিত ছিল, তা বের হয়ে সমাপ্ত হবার পরে বর্তমান সময়ে রক্ষিত গম নীচে বের হয়ে আসবে। তাই আপনি যখন কোন্দো খাবেন, তখন আমি গম খাবো। তদ্রূপ ভাবে কর্মফল ভোগের জন্য আমাকে ধৈর্য্য-ধারণ করে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, ঈশ্বরের উপর শ্রদ্ধা রাখতে হবে এবং কর্মের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বিধি-বিধানের উপরও পূর্ণ শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখতেই হবে।

ধরুন, একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমার নিকটতম আত্মীয়, তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। সেই ব্যাঙ্কে আমার একটি একাউন্ট ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাতে কোন অর্থ সঞ্চিত নেই, একাউন্টটি মাত্র রয়েছে। আমি যদি মাত্র পাঁচ টাকার একটি চেক ব্যাঙ্কে পাঠাই তাহলে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তা গ্রহণ করবেন না। অন্যদিকে ধরুন ব্যাঙ্কে আপনার একাউন্টে প্রচুর টাকা সঞ্চিত রয়েছে। কিন্তু ঐ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার ঘোর শত্রুতা রয়েছে। তবুও আপনার এক হাজার টাকার চেকটি ম্যানেজার গ্রহণ করে, অর্থ প্রদান করবেন। এজন্য আমি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের উপর অসন্তুষ্ট হতে পারিনা। তাই সুখ ভোগ চাইলে সতকর্তার সাথে পূণ্য কর্ম সঞ্চয় আমাকে করতে হবে।

9. প্রতিটি কর্ম ফল দিয়েই শান্ত হয় (কর্মফল ভোগ করতেই

হয়) : ধরুন, একজন মানুষ এমন একটি পাপ করেছে যে এর ফলে এক দিবস উপবাস থাকার প্রারব্ধ সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি সাত্ত্বিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাই একদিন একাদশী ব্রত পালন করলেন, সমস্ত দিন নারায়ণের স্মরণ করে কাটালেন এবং সেই সঙ্গে উপবাস করলেন। তিনি উপবাস করলেন, অথচ সাত্ত্বিক কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি উপবাস রূপ নিজ প্রারব্ধ ভোগ করলেন।

আর ঐ ব্যক্তি যদি রজোগুণ সম্পন্ন হয়ে থাকেন তাহলে তার প্রারব্ধ অন্যভাবে ভোগ হতে পারে। হয়ত তার স্ত্রী একদিন অত্যন্ত অসুস্থ হলেন, তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন, তারপর অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য উপবাসী হয়েই শিশু সন্তানটিকে অত্যন্ত ব্যাকুল অবস্থায় দেখে ওর সেবাশুশ্রুষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উপবাসী অবস্থাতেই শয়ন করলেন। এমনি ভাবে এক দিবস উপবাস থাকার প্রারব্ধ ভোগ হয়ে গেল।

ঐ ব্যক্তি যদি তমোগুণী জীব হয়ে থাকেন তাহলে ধরুন দুপুরে ভোজন করার জন্য বসে আহার সামগ্রী রুচিকর না হওয়ায় খাবার থালাটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, তারপর মারামারি করে কিছু না খেয়েই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় নিজের অফিসে চলে গেলেন। সেখানেও ঐ দিন সহকর্মীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ হলো। রাত্রে গৃহে ফিরে অত্যন্ত ক্রোধের বশে স্ত্রী এবং সন্তানদের মারধর করে উপবাসী অবস্থায় শয়ন করলো, এমনি ভাবে এক দিবস উপবাস করার প্রারব্ধ তাঁর ভোগ হলো।

এরূপ ভাবে সত্ত্বগুণী ব্যক্তি ব্রত উপবাস করে প্রারব্ধ ভোগ করলেন, সেই সাথে সামান্য পূণ্যও অর্জন করলেন যাতে নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম-ফল সৃষ্টি হলো।

রজোগুণী ব্যক্তি স্ত্রী এবং সন্তানের সেবা-চিন্তার মধ্য দিয়ে এক দিনের উপবাস-প্রারব্ধ ভোগ করলেন, কিন্তু কোন পূণ্য অর্জন করেননি, পাপ কর্মও করেননি।

আর তমোগুণী ব্যক্তি অত্যন্ত ক্লেশের মধ্য দিয়ে একদিনের উপবাস-প্রারব্ধ ভোগ করলো, অধিকন্তু কিছু পাপ কর্মও করলো, যার পরিণাম স্বরূপ নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম করায় তা পরিপক্ক হয়ে কষ্টদায়ক কিছু প্রারব্ধ-জাত দুঃখ, ভোগ করতে হবে।

ক্রিয়মাণ কর্ম পরিপক্ক হয়ে ফলস্বরূপ প্রারব্ধরূপে সন্মুখে উপস্থিত হবেই, তা ভোগ দ্বারা সমাপ্ত হবে। কিন্তু সত্ত্বগুণী, রজোগুণী এবং তমোগুণী মানুষের প্রারব্ধ ভোগ করার রীতি বা পদ্ধতি উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হলো যে তা পৃথক ধরণের হয়ে থাকে।

মনে করুন, আমি কোন একটি পবিত্র এবং শুভ কর্ম করলাম বলে এর ফলস্বরূপ আমার পাঁচশত টাকা প্রাপ্তির প্রারব্ধ সৃষ্টি হলো। এইপ্রারব্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভোগ না করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাঁচশত টাকা আমাকে প্রদানের জন্য আমার পিছনে পিছনে ভ্রমণ করবে। আমাকে পাঁচশত টাকা দিয়েই তারপর ঐ প্রারব্ধ সমাপ্ত হবে।

ধরুন, একদিন রাত্রি বারটার সময় এক ব্যক্তি আমার গৃহের দরজায় মৃদু আঘাত করে খট্ খট্ শব্দ করে আমাকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলো, তারপর আমার সন্মুখে পাঁচশত টাকা ঘুষ রূপে রেখে বললো, "আপনি তো রাজস্ব বিভাগে কাজ করেন আপনি আমার পিতার ভূমিতে আমার ভাইয়ের নাম কেটে দিয়ে সম্পূর্ণ জমি আমার নামে লিখে দিন। রাজস্ব বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে আপনি তা করে দিতে পারেন।" যদি আমি তমোগুণী, নীতিহীন, হীনমনা ব্যক্তি হই তাহলে

সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ঐ পাঁচশত টাকা ঘুষ নিয়ে তার অনুচিত অনুরোধ অনুসারে তাকে লাভবান করানোর জন্য চেষ্টা করতে পারি। এমনি ভাবে আমার প্রারব্ধের পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত করে আমি তা ভোগ করে নিতে পারি। তাতে আমার প্রথমের ক্রিয়মাণ কর্ম প্রারব্ধ ফল দিয়ে সমাপ্ত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু সাথে সাথে আমি ঘুষ নিয়ে যে এক নূতন পাপ করলাম তা পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধ রূপে একদিন অবশ্যই আমার সম্মুখে উপস্থিত হবেই। সেই প্রারব্ধ আমাকে ভোগ করতে হবে।

আমি যদি তমোগুণী ব্যক্তি না হয়ে থাকি, তাহলে এই পাঁচশত টাকার ঘুষ গ্রহণ করতে আমি অস্বীকার করবো। কিন্তু প্রারব্ধরূপে ঐ সময় পাঁচশত টাকা গ্রহন না করলেও ফল প্রদান না করে তা শান্ত বা নাশ হবে না। সেই পাঁচশত টাকা প্রারব্ধ ভোগ করানোর জন্য আমার পিছনে পিছনে ভ্রমণ করবেই।

তারপর ধরুন, আমি আমার বাড়িটা বিক্রয় করতে ইচ্ছুক এবং তা এক ব্যক্তির কাছে বিক্রয়ের জন্য কথা দিয়েছি যে ৩০,০০০/- হাজার টাকায় তা তার নিকট বিক্রয় করবো। মনে করুন আমি রজগুণী ব্যক্তি। আর এক স্বার্থপর ব্যক্তি আমার বাড়িটি ক্রয় জন্য ৩০,৫০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আমি রজগুণী ব্যক্তি হিসাবে পাঁচশত টাকা অধিক প্রাপ্তির লোভে পূর্ব ব্যক্তির সঙ্গে কথা ও শর্ত ভঙ্গ করে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট বাড়িটি বিক্রি করে দিয়ে পাঁচশত টাকার প্রারব্ধ ভোগ করলাম। পাঁচশত টাকা প্রাপ্তির প্রারব্ধ ভোগ করায় সেই প্রারব্ধ শান্ত বা সমাপ্ত হলো। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করায় পাপ জনিত নূতন প্রারব্ধ সৃষ্টি হবেই।

আর আমি যদি রজোগুণী ব্যক্তি না হওয়াতে ঐ পাঁচশত টাকা প্রাপ্তির

লোভ না করে পূর্ব কথা ও শর্তানুসারে প্রথম ক্রেতার নিকট ঐ বাড়ি ৩০০০০/- হাজার টাকাতেই বিক্রি করে দিই, তাহলে ঐ সময় আমার পাঁচশত টাকা প্রাপ্তির প্রারব্ধ আমাকে একটু 'ধাক্কা' দিয়ে পুনঃ ফিরে গেল, কিন্তু প্রারব্ধ সমাপ্ত না হওয়ায় তা পুনঃ ফিরে আসবেই, ক্রিয়মাণ কর্মের ফল প্রারব্ধ আমার পিছনে চলা বন্ধ করবেনা।

মনে করুন আমি এস, টি বাসের একজন কনডাক্টর। এক বাস যাত্রী একলাখ টাকার একটি থলি ভুলক্রমে বাসের মধ্যে ফেলেই চলে গেল। থলির মধ্যে তার নাম, ঠিকানা থাকায় এবং আমি পরম সাত্ত্বিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ায় ঐ টাকার থলিটি নিয়ে সেই ব্যক্তির নিকট পৌঁছে সম্পূর্ণ অর্থ তাকে দিয়ে দিলাম। তখন সেই ব্যক্তি অতি প্রসন্ন হয়ে অত্যন্ত প্রেম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে, পাঁচশ টাকা আমাকে পুরস্কার হিসাবে প্রদান করলেন। তাঁর শ্রদ্ধা, প্রেম এবং আগ্রহকে স্বীকার করে তখন আমি তার দেওয়া পাঁচশ টাকা গ্রহণ করলাম। এমনি ভাবে পাঁচশত টাকা প্রাপ্তির প্রারব্ধ আমি ভোগ করলাম। আর সেই সঙ্গে আমি সামান্য পুণ্যও অর্জন করলাম। এরূপ ভাবে যে কোন উপায়ে পাঁচশত টাকা প্রদান করেই আমার পূর্বের ক্রিয়মাণ কর্ম প্রারব্ধ রূপে ফল দিয়ে তারপর শান্ত বা নাশ হলো। আমি তমোগুণী ব্যক্তি হলে ঘুষ গ্রহণ করে আমার প্রারব্ধ ভোগ করতাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সত্ত্বগুণী বা রজোগুণী বা তমোগুণী ব্যক্তির প্রারব্ধ ভোগ করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদেরকে নিজ প্রারব্ধ ভোগ করতেই হবে, তবেই কর্ম ফল শান্ত বা নাশ হবে।

10. ক্রিয়মাণ কর্ম করার পদ্ধতি : দেখা গেল যে সত্ত্বগুণী, রজোগুণী এবং তমোগুণী ব্যক্তিদের ক্রিয়মাণ কর্ম করার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও কর্মের ফল পেতেই হয়। কিন্তু সত্ত্বগুণী ব্যক্তিরা বলেন, "ফল প্রাপ্তি হোক আর

নাই হোক কর্ম করবো।” রজোগুণী ব্যক্তি বলেন, “আমি কর্ম করবো, কিন্তু ফল ত্যাগ করবো না।” আর তমোগুণী ব্যক্তি বলেন, “ফল-প্রাপ্তি পূর্বে চাই, পরে কর্ম করবো, ফল প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কর্মই করবো না।”

ধরুন, এক ব্যক্তির কোন পুত্র রাত্রি বারটার সময় অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন ঐ ব্যক্তি মধ্যরাত্রিতে এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিদ্রা থেকে তাকে ওঠালেন। ঐ ব্যক্তির পুত্র অত্যন্ত অসুস্থ জেনে ডাক্তার তৎক্ষণাৎ তার ব্যাগের মধ্যে ঔষধ, ইনজেকশন নিয়ে রোগী দেখার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঐ ব্যক্তি ডাক্তারের ফিস্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সত্ত্বগুণী ডাক্তার বললেন, “এসব কথা পরে হবে, প্রথমে আপনার পুত্রের কষ্ট দূর করতে দিন।” ডাক্তার সত্ত্বগুণী হওয়াতে এরূপ বললেন।

কিন্তু ঐ ডাক্তার যদি রজোগুণী হতেন তাহলে হয়ত বলতেন, “রোগীর কষ্ট দূর করে দিব ঠিকই, কিন্তু আমাকে দশ টাকা ফিস দিতে হবে।” আর ডাক্তার তমোগুণী হলে হয়ত বলবে, “আগে আমার ভিজিট- ফিস দশ টাকা রাখুন, তারপর আমি রোগী দেখতে যাবো।”

উক্ত তিন প্রকার গুণ সম্পন্ন ডাক্তারদের নিজ ফিস তো প্রাপ্ত হবারই কথা। কিন্তু তাদের ক্রিয়মাণ কর্ম করার পদ্ধতি ভিন্ন। রোগীর পিতা সত্ত্বগুণী ডাক্তারকে প্রসন্নতার সাথে দশ টাকা প্রদান করবেন আর তমোগুণী ডাক্তারকে দশ টাকাই প্রদান করবেন, তবে অপ্রসন্নতার সাথে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক দ্রব্য ক্রয় করার বেলায় ও এরূপ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ধরুন আপনি সাত্ত্বিক দ্রব্য ঘি ক্রয় করতে গেলেন। তখন হয়ত ঘি-বিক্রেতা আপনাকে বলবেন, “ভাই ঘি পরীক্ষা করে দেখুন, কি সুন্দর সুগন্ধযুক্ত ঘি। পছন্দ হলে তবেই ক্রয় করুন। ঘরে নিয়ে ব্যবহার

করার পরেও যদি তা আপনার পছন্দ না হয় তাহলে ঘি ফেরৎ দিয়ে এর মূল্য ফেরৎ নিয়ে যাবেন।"

কিন্তু রজোগুণী দ্রব্য যেমন রেডিও, টিউব-লাইট, বিজলীর অন্যান্য জাগতিক সুখ ও বিলাসযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করতে গেলে দোকানদারের ছাপানো বিলে দেখতে পারবেন যে এরূপ লিখা রয়েছে, "ক্রয় করার পরে দ্রব্য ভেঙ্গে গেলে বা তাতে কোন গোলযোগ ধরা পড়লে সেই দ্রব্য ফেরৎ নেওয়া হবে না, অর্থও ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।"

আর তমোগুণী দ্রব্য ক্রয় করতে গেলে ব্যবসায়ী প্রথমেই অর্থ গ্রহণ করে পরে আপনাকে দ্রব্য দিবে। যেমন সিনেমা দেখার জন্য প্রথমে জানালা দিয়ে অর্থ দিয়ে টিকিট ক্রয় করে পরে হলে প্রবেশ করতে হয়। তারপরে সেখানে অন্ধকারে বসে ভাল লাগলে সিনেমা দেখুন, অন্যথায় চলে যান, তাতে আপত্তি নেই। বেশ্যা ও উকিল ব্যক্তিরা হাতে অর্থ না আসা পর্যন্ত মক্কেলের সাথে কথাও বলবে না। তাদের ভাবনা হলো, "প্রথমে অর্থ রাখুন, তারপরে আপনাকে দেখবো।"

11. প্রারব্ধে যা আছে, ততটুকুই মাত্র প্রাপ্ত হবে : ক্রিয়মাণ কর্ম যেরূপ ভাবে করা হয়, প্রারব্ধও তদ্রূপ ভাবে সৃষ্টি হয়, ততটুকুই মাত্র প্রারব্ধ লাভ হবে, না সামান্য কম, না সামান্য বেশি। ক্রিয়মান কর্ম পরিপক্ক হয়ে ফল দেবার জন্য প্রারব্ধ রূপে পরিণত হয়। যেরূপ প্রারব্ধ ভোগ করতে হবে তদ্রূপ দেহ, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, পরিবেশ ইত্যাদি লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগের অনুকুল মাতা-পিতা গৃহ, স্ত্রী-পুত্র, পরিবেশ ইত্যাদি লাভ হয়। কিরূপ মাতা-পিতার গৃহে আমি জন্মগ্রহণ করবো, তা আমি নিজে পছন্দ করতে পারিনা, আমার ক্রিয়মাণ কর্ম দ্বারা তা স্থির হয়। মনে করুন যেখানে জন্মের পরেই পাঁচ-পঁচিশটি বাড়ী, গাড়ীর মালিক হয়ে যাবে এমন ধনাঢ্য ব্যক্তি বিড়লা শেঠের গৃহে কেহ

জন্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে নিজ ইচ্ছানুসারে সে জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। এসব ঋণানুবন্ধ, অর্থাৎ নিজ প্রারব্ধ অনুসারে তা লাভ হয়ে থাকে।

"ঋণকে সম্বন্ধ সে আ মিলে সুত, বিত্ত, দারা ঔর দেহ।"

আবার আপনার ঋণানুবন্ধ সমাপ্ত বা পূর্ণ হলেই তৎক্ষণাৎ এসব বিয়োগ হয়ে যায়। আপনার দ্বারা করা ক্রিয়মাণ কর্ম পরিপক্ক হয়ে আপনার প্রারব্ধ রূপে তা আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আর তা ইহ জীবনে ভোগের পরে দেহপাত হয়ে থাকে।

"যস্মাৎ চ যেন চ যথা চ যদা চ যৎ চ
যাবৎ চ যত্র চ শুভাশুভমাত্মকর্ম।
তস্মাৎ চ তেন চ তথা চ তদা চ তচ্চ,
তাবৎ চ তত্র চ বিধাতৃবশাৎ উপৈতি।।"

অর্থাৎ "যে স্থানে, যার নিকট থেকে, যেরূপ ভাবে, যখন যতক্ষণ পর্যন্ত, যে সকল শুভ-অশুভ ক্রিয়মাণ কর্ম করা হয়েছে, তা নির্দ্দিষ্ট সময়ে (যথা-সময়ে) তা প্রারব্ধ রূপে আপনার কাছে উপস্থিত হবে।"

প্রারব্ধকে কিছু দৃষ্টান্ত দ্বারা এবার বুঝানো যাক্। মুখ্যমন্ত্রী তার চাপরাসীর উপর খুব প্রসন্ন হলেও ওকে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করতে পারেন না।

"তুষ্টোহপি রাজা যদি সেবকভ্যোঃ ভাগ্যাৎ পরম নৈব দদাতি কিঞ্চিৎ।
অহর্নিশং বর্ষতি বারিবাহঃ তথাপি পত্রত্রিত্রয়ঃ পলাসঃ।।"

অর্থাৎ "রাজা সেবকের উপর খুব প্রসন্ন হলেও ওর প্রারব্ধ বা ভাগ্যে যা পাওয়ার আছে এর চেয়ে সামান্যও অধিক তিনি দিতে পারেননা, আর

জোর করে দেবার চেষ্টা করলেও তা তার হাত থেকে বের হয়ে যাবে। চব্বিশ ঘণ্টা, তিনশত পষট্টি দিন বৃষ্টি বর্ষণ হলেও পলাশ বৃক্ষে শুধু মাত্র তিনটি পত্র থাকবে, চতুর্থ পত্র হবেনা।"

বসন্ত ঋতুতে জগতের অনেক বৃক্ষেই নূতন পত্রের সঞ্চার হয়। কিন্তু কেওড়া-বৃক্ষে তখন নূতন পত্র জন্মায় না। তাতে বসন্ত ঋতুর কোন দোষ নেই। সূর্যনারায়ণ উদিত হলে জগতের সকলে সেই প্রকাশ অনুভব করেন। কিন্তু পেঁচক দিনের বেলায় দেখতে পায়না, তাতে সূর্যনারায়ণের কোন দোষ নেই। চাতুর্মাস বর্ষায় গরীব ধনী সবার গৃহে সমান ভাবে বর্ষণ হলেও চাতক পাখী মুখ খুলে বসে থাকলেও ওর মুখে এক ফোঁটা জলও প্রবেশ করেনা, তাতে বর্ষার কোন দোষ নেই।

"পত্রং নৈব যদা করীর বিটপে দোষো বসন্তস্য কিং
নোলুকোপ্যবলোকতে যদি দিবা সূর্যস্য কিং দুষনম্।
ধারা নৈব পতন্তি চাতক মুখে মেঘস্য কিং দুষণং
যৎ পূর্বং বিধাতা ললাট লিখিতং তৎ মার্জিতুঃ কঃ ক্ষমঃ।।"

প্রারব্ধ যা নির্মাণ হয়ে গেছে, তা ভোগ না করে নাশ হবেনা। এরূপ মান্যতা রয়েছে যে মানুষের জন্মের ছয় দিন পরে বিধাতা তার ভাগ্য লিখে দেন। তা সত্য হলেও কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়মাণ কর্ম করেছেন তা পরিপক্ক হয়ে যেরূপ এবং যতটুকু প্রারব্ধ তার নির্মাণ হয়েছে তা থেকে সামান্য কম বা অধিক তার ভাগ্যে লিখেন না। আপনার প্রারব্ধে যতটুকু উপার্জন করা নির্দ্দিষ্ট রয়েছে এর চেয়ে একটি টাকাও কম বা বেশি আপনার প্রাপ্তি হবে না। বক্র পন্থায়, অবৈধ উপায়ে অধিক অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টা করলে, নূতন অন্যায়, অবৈধ ক্রিয়মাণ কর্মে আপনি ফেঁসে যাবেন। একজন সংস্কৃত কবি এ বিষয়ে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন,

"মা ধাব মা ধাব বিনৈব দ্রব্যং ন ধাবনং কারণমস্তি লক্ষ্ম্যাঃ।

চেৎ ধাবনং কারণমস্তি লক্ষ্ম্যম্যাঃ শ্বানঃ যোং ধাবমানো ন খলু ধনাঢ্যঃ।।”

অর্থাৎ “অর্থের জন্য অন্যায় পথে ছোটাছুটি করোনা। কারণ ছোটাছুটি করলেই অর্থ আসে না। যদি বৃথা ছোটাছুটি করলেই অর্থ আসতো তাহলে কুকুর সারাদিন ধরে গ্রামের এক গলি হতে অন্য গলিতে দৌড়াদৌড়ি করে, স্থির হয়ে এক জায়গায় বসেনা, তথাপি সে ধনবান হয়না।” বলার উদ্দেশ্য হলো আপনার নিজের করা ক্রিয়মাণ কর্ম অনুসারে আপনার প্রারব্ধ জন্মের সঙ্গেই নির্মাণ হয়ে গেছে। আর তাই আপনি কোটি উপায় অবলম্বন করেও এর থেকে অতিরিক্ত কিছু লাভ করবেন না।

12. তাহলে উদ্যম এবং পুরুষার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন কী? : কর্মের সিদ্ধান্তে (বিধি-বিধানে) পুরুষার্থের সঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে কোন অত্যধিক গোঁড়া, দুরাগ্রহ বা হঠকারী, প্রারব্ধবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তি ভ্রান্তি বশে মনে করে, “প্রারব্ধই সব কিছু, তাই কোনরূপ পুরুষার্থ প্রয়োগের আবশ্যকতা নেই, প্রারব্ধে যা আছে তাই মাত্র প্রাপ্তি হবে। প্রারব্ধে পরীক্ষাতে পাশ হবার থাকলে পাশ হবে। অন্যথায়, কতই না পরিশ্রম করলেও প্রারব্ধে ফেল হবার থাকলে ফেল হবেই। পড়াশুনায় কষ্ট করা, পরিশ্রম করা, এসব বৃথা। তাই এসবের কোন প্রয়োজন নেই।” এরূপ কোন কোন মূর্খ, প্রারব্ধবাদী বিদ্যার্থী ভগবানের উপর ভরসা করে (যদিও তা যথার্থ ভরসা নয়) নিজে অলস হয়ে বসে থাকে এবং পরিণামে পরীক্ষায় ফেল করে। এরূপ এক গোঁড়া ছাত্র যে প্রারব্ধের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী, সে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যা অর্জন শুরু করেছিল। শুদ্ধ সংস্কৃত বলতে সক্ষম ছিলনা বলে অশুদ্ধ এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় তার মনের ভাবটি প্রকাশ করে বলল,

“ভনতব্যং তো ভী মরতব্যং ঔর নহীঁ ভনতব্যং তো ভী

মরতব্যং তো ফির কায়কু মাথাকুটং করতব্যম্।।"

অর্থাৎ "পড়াশুনা করলেও মৃত্যু হবে, পড়াশুনা না করলেও একদিন মৃত্যু হবে। তাই পড়াশুনার জন্য এত মাথা ব্যথা কেন?"

আসল কথা হলো—এমন মূর্খ এবং পাগল প্রারব্ধবাদী ব্যক্তি 'পুরুষাকারের অর্থ বুঝতে পারে না। একথা বাস্তবিক সত্য যে প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্তি হয়ে থাকে, কিন্তু বিশেষ কথা হলো কোথায় প্রারব্ধ কাজ করছে, কোথায় পুরুষার্থ প্রয়োগ করতে হবে এ বিষয়ে আমাদের সঠিক এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। চাকুরী লাভ করা প্রারব্ধ, কিন্তু তা সঠিক রূপে বজায় রাখার জন্য পুরুষার্থও আবশ্যক। নূতন গৃহ প্রাপ্তি হওয়া প্রারব্ধের বিষয়, অর্থাৎ তা প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে। কিন্তু গৃহ লাভের পরে তা সঠিক রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পুরুষার্থের আবশ্যকতা রয়েছে। অর্থ প্রাপ্তির পরে এর সদ্ উপযোগ করা পুরুষার্থ। পুত্র প্রাপ্তি হওয়া প্রারব্ধ, কিন্তু পুত্রকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা পুরুষার্থ। এটা সত্য যে প্রারব্ধ অনুসারে চাকুরী, অর্থলাভ হবে, স্ত্রী-পুত্রাদি লাভ হবে, কিন্তু যা লাভ হয়েছে তা সাধনা রূপে বিবেক বুদ্ধির সহায়তায় সদ্ -উপযোগ করাই সঠিক পুরুষার্থ। সম্পত্তি লাভ প্রারব্ধ অনুসারে হয়ে থাকে, কিন্তু তা সংরক্ষণ এবং সঠিক উপযোগ করা পুরুষার্থ। তা আমাদের অবশ্যই করা কর্ত্তব্য। অর্থ কম বা অধিক প্রাপ্ত হওয়া প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা সৎ উপায়ে উপার্জন করা পুরুষার্থ। অধিক অর্থ লাভ হলেই যে সুখ-শান্তি প্রাপ্তি হবে, এরূপ ধারণা ভুল। অধর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করে থাকে, দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির কারণ হয়ে থাকে। হয়ত সেই পাপের ফলে তার পুত্র অনুপযুক্ত, বিকলাঙ্গ হতে পারে, হয়ত তার লজ্জীহীনা স্ত্রী (অবিদ্যাগ্রস্ত স্ত্রী) লাভ হতে পারে।

অর্থলাভ হলে ঐ সুযোগের সদ্-ব্যবহার করে মানুষকে মোক্ষ লাভের

চেষ্টা করা উচিত। আর অর্থ প্রাপ্তি না হলেও সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মোক্ষ মার্গে চলা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলাভ হলে সেই সুযোগ নিয়ে মোক্ষ মার্গে চলা উচিত। আর স্ত্রী লাভ না হলেও সেই সুযোগে মোক্ষ মার্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। ব্রহ্মচারী বা বিধুর হবার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েও মোক্ষ মার্গে অগ্রসর হওয়া কাম্য। প্রারব্ধ বশে যেরূপ দেহ, স্ত্রী-পুত্র, ধন ইত্যাদি যা কিছু প্রাপ্ত হোক না কেন অথবা তা প্রাপ্ত না হলেও সেই অবস্থাতেই, সেই সুযোগে মোক্ষ মার্গে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করাই পুরুষার্থ।

"অকৃত্বা পর সন্তাপম্ অগত্বা নম্রতাম্।
অক্লেশয়িত্বা নির্জাত্মানম্ যৎ স্বল্পমপি তদ্‌বহুঃ।।"

অর্থাৎ "কোনও জীবাত্মাকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে, জাগতিক স্বার্থ লাভের ইচ্ছায় কোন হীন ব্যক্তির কাছে না গিয়ে এবং নিজের অন্তরাত্মাকে ক্লেশ না দিয়ে প্রারব্ধ বশে যা কিছু প্রাপ্তি হয় তা সামান্য হলেও তাতেই সন্তুষ্ট থেকে সতত পুরুষার্থ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য।"

13. প্রারব্ধকে কোথায় মেনে নেওয়া এবং কোথায় পুরুষার্থ প্রয়োগ করা ? : মানুষের জীবনে কাল চক্রে অনেক কিছুই প্রাপ্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে থাকে। ধন-জন, স্ত্রী-পুত্র, গাড়ী-বাড়ী, নাম-যশ, দান, ধ্যান, মোক্ষ, ধর্ম ইত্যাদি কত কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছা, কামনা-বাসনা রূপে মানুষের মনে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এই সকল ইচ্ছা গুলিকে শাস্ত্র চার ভাগে বিভক্ত করেছে। যথা— (১) ধর্ম (২) অর্থ (৩) কাম এবং (৪) মোক্ষ।

উপরোক্ত চার বিষয়ই মানুষের প্রাপ্ত করা আবশ্যক। ধর্মসঙ্গত উপায়ে অর্থ উপার্জন করা কর্ত্তব্য। অধার্মিক উপায়ে অর্জিত অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করে থাকে। ধর্ম এবং অর্থ প্রাপ্তির পর কাম-তৃপ্ত হয়ে জীবকে প্রধান ধ্যেয়

'মোক্ষ' প্রাপ্ত করা আবশ্যক। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম ধর্ম এবং চতুর্থ বিষয় মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য মানুষকে সতত পুরুষার্থ প্রয়োগ করা একান্তই আবশ্যক। এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কখনও প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আর দুই নম্বরে উল্লিখিত অর্থ এবং তিন নম্বরে উল্লিখিত 'কাম' এই দু'টি বিষয় লাভের জন্য নিজ প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দেওয়া কর্ত্তব্য, এর জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা এর উল্টো চেষ্টা করে থাকি। অর্থাৎ অর্থ এবং কাম প্রারব্ধের উপর ছেড়ে না দিয়ে, এগুলির জন্য রাত-দিন, সতত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু প্রারব্ধের জন্য পরে সেই চেষ্টা লঘু গতি প্রাপ্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ ধর্ম এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আমাদের সতত, সতর্কতার সাথে পুরুষার্থপ্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু আমরা তা করিনা, তা প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দিই। ফলে তা প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে, সহজে লাভ হয়না। মহাভারতে মহর্ষি ব্যাসদেব বলেছেন,

"উর্দ্ধবাহুর্বিরোম্যেষ ন চ কশ্চিতচ্ছৃনীতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে।।"

অর্থাৎ "আমি দু'হাত উঠিয়ে সমগ্র জগতকে সাবধান করে দিচ্ছি, কিন্তু কেউ আমার কথা শ্রবণ করছেনা। ধর্ম দ্বারাই অর্থ এবং কাম প্রাপ্তি হয়ে থাকে। তাহলে সেই ধর্ম সেবন আপনারা কেন করছেন না?" ব্যাসদেব অর্থ এবং কামনার বিরোধীতা করছেন না। কিন্তু অর্থ এবং কাম, ধর্ম মর্যাদা রক্ষা করে, মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এই সত্য-সনাতন বিষয়টিই প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বোঝানোর জন্য মহর্ষি বেদ-ব্যাস সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেছেন। আপনি ভাগ্যবান হলে তা পাঠ করবেন।

14. বস্তুতঃ প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই

বরং একে অপরের পরিপূরক : আজ যে ক্রিয়মাণ কর্ম করা হলো, তা সঞ্চিত রূপে জমা হয়ে যাবে এবং যথাসময়ে পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধে পরিণত হয়ে যাবে। প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য অনুকূল শরীর প্রাপ্ত হবে। আসলে পুরুষার্থই সময় মত প্রারব্ধ তৈরি করে। তাই বস্তুতঃ প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ একই। এই উভয়ের কার্যক্ষেত্র পৃথক পৃথক হলেও একে অপরের সাথে বিরোধ নেই। প্রারব্ধ বর্তমান শরীরকে ভোগ প্রদান করে থাকে। আর পুরুষার্থ ভবিষ্যতের 'সৃষ্টি' প্রস্তুত করে থাকে। কালান্তরে পুরুষার্থই প্রারব্ধ তৈরী হয়ে ভবিষ্যতের শরীরকে ভোগ প্রদান করে। তাই ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবাদ লক্ষ্য করা যায়।

"Man is the architect of his own fortune."

অর্থাৎ "মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-রচয়িতা।"

মানুষ নিজের প্রারব্ধ স্বয়ং নিজের পুরুষার্থ দ্বারা নির্মাণ করতে পারে। প্রারব্ধ বিনা পুরুষার্থ পঙ্গু এবং পুরুষার্থ বিনা প্রারব্ধ অন্ধ। 'প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ প্রয়োগ', এই উভয় একে অপরকে কিভাবে সহায়তা করে থাকে, এ সম্বন্ধে এক অন্ধ এবং আর এক পঙ্গু ব্যক্তির একসাথে বন্ধুত্ব করে রাস্তা চলে সফলতা পূর্বক গন্তব্যস্থলে পৌঁছোনোর কাহিনীটি স্মরণ যোগ্য। অন্ধ ব্যক্তি রাস্তা দেখতে পারেনা, পঙ্গু রাস্তা চলতে পারে না, কিন্তু রাস্তা দেখতে পারে। তাই দুজনই রাস্তা চলতে অসমর্থ। এই অবস্থায় দুজনে এক জায়গায় যাবার জন্য বন্ধুত্ব করে তাদের বিবেক বুদ্ধি এবং সামর্থ্য প্রয়োগ করলো। পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধব্যক্তির কাঁধে চড়ে বসে রাস্তা বলে দিয়ে তারা উভয়ে সফলতা পূর্বক গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেল। তদ্রূপ মানুষের জীবন-যাত্রায় 'পুরুষার্থ প্রয়োগ' এবং প্রারব্ধ এই উভয়ে একে অপরের সহায়ক, পরিপূরক হয়।

প্রারব্ধ আপনার স্বয়ং অর্জিত, যা আপনাকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করাচ্ছে।

বস্তুতঃ অপর কোন ব্যক্তি আপনাকে সুখ-দুঃখ দেয়না, দিচ্ছে না, তিনি তো কেবল নিমিত্ত মাত্র।

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা পরো দদাতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্মসূত্রাৎ গ্রথিতো হি লোকঃ।।"

15. মানুষ কর্ম করার বিষয়ে স্বাধীন কিন্তু ফলভোগের ক্ষেত্রে পরাধীন : শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ২।৪৭ নং শ্লোকটি কর্ম করার বিষয়ে একটি মহাবাক্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিলেন,"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

অর্থাৎ "কর্ম করার অধিকার তোমার রয়েছে কিন্তু ফলে নয়। তুমি কর্ম কর কিন্তু ফলের আশা করোনা।" এই মহা বাক্যটির গূঢ়ার্থ সকলের পক্ষে বুঝা এবং গ্রহণ করা কঠিন বিষয়। 'কর্ম কর, কিন্তু কর্ম ফলের আশা রেখোনা' ভগবান এ কেমন কথা বললেন? এই কথার তাৎপর্য্য কি? মনে করুন, আপনি কোন স্থানে এক মাস ধরে চাকুরী করলেন, কিন্তু মাসের শেষে কাজের পারিশ্রমিক ও ফলস্বরূপ আপনি বেতন চাইতে পারবেন না। তা কি হয়? এ কেমন কথা? রেলস্টেশনে কুলী আমার মাল-পত্র ট্রেনে উঠিয়ে দিল। আমি গীতার উপদেশ শুনিয়ে বলতে পারি কী, "ভাই, তুমি গীতা পড়। কর্ম করা তোমার অধিকার, ফল বা মজুরী দাবী করার অধিকার তোমার নেই।" এমন কথা বললে সে হয়ত জবাবে বলবে, "গীতা-জ্ঞানে আমার আবশ্যকতা নেই। আমি পারিশ্রমিক চাই। গীতা আপনি নিজে পড়ে নিন্, আমাকে আমার পারিশ্রমিক অর্থ দিয়ে দিন।" আসল কথা হলো কর্ম করলে ফল প্রাপ্তি হবেই। ফল না দিয়ে কর্ম শান্ত, সমাপ্ত বা নাশ হয়না।

উপরোক্ত ভগবদ্ গীতার মহাবাক্যের অর্থ স্পষ্ট। "কর্ম করার বিষয়ে মানুষ স্বাধীন কিন্তু ফলভোগের ক্ষেত্রে পরাধীন।" অর্থাৎ কর্মকরা, না করা, কোন্ কর্মকরা, কিরূপে কর্ম করা, কিরূপে না করা? শুদ্ধ-বুদ্ধি, বিবেক—বিচারকে উপযোগ করে কিভাবে কর্মেপ্রবৃত্ত হওয়া, এসব বিষয়ে মানুষ স্বাধীন, কিন্তু সেই কর্মের ফল ভোগের বিষয়ে মানুষ স্বাধীন নয়। অর্থাৎ কর্মের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে, এড়ানোর কোন উপায় নেই। তাই ফল ভোগের বেলায় সম্পূর্ণ পরাধীন, মোটেই স্বাধীন নয়। অর্থাৎ কর্ম ফলভোগ করতে না চাইলেও ফল ভোগ করতে বাধ্য। তা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় কার্যকরী হবেনা।

ধরুন, এক নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে আমি আপনার বাড়ীতে ভোজন করার জন্য গেলাম। আপনি আমার জন্য পায়েস, পুরী, ডাল-ভাত, দু'প্রকারের তরকারী, ভাজা, মটরশুঁটি, আচার, চাট্নী, পাপড় ইত্যাদি অনেক রকমের সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের জন্য তৈরি করলেন। এই সকল খাদ্যের মধ্যে কী কী খাদ্য খাবো, কী কী খাদ্য খাবোনা এবং কোন্ পদগুলি অধিক পরিমাণে খাবো এ বিষয়ে আমি স্বাধীন। যে খাদ্য গুলি আমার অধিক পছন্দের, তা আমি অধিক পরিমাণে খাবো, হয়ত তা আপনি প্রেমের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরিবেশন করবেন। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য অনুকূল, কোন্ খাদ্য প্রতিকূল তা বিচার আমাকেই করতে হবে, আপনাকে নয়। হয়ত আমি অধিক পরিমাণে মটরশুঁটি খেলাম, আপনি খুশী হয়ে থালা ভর্ত্তি করে মটরশুঁটির তরকারী পরিবেশন করলেন। আমি বিবেক-বুদ্ধি বিচার রূপ পুরুষকার প্রয়োগ না করে অধিক পরিমাণে মটরশুঁটি খেলাম, অধিক পরিমাণে মটরশুঁটি খাওয়ার বিষয়ে আমি স্বাধীন। এবার কর্মফল রূপে আমাকে বারবার পায়খানায় দৌড়তে

হচ্ছে, পায়খানা হচ্ছে। এই কর্মফল ভোগে আমি পরাধীন, ফলে আমার অধিকার নেই। কর্মফলের পরিণামকে এড়াতে না পেরে বিবশ হয়ে তা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছি, তখন আপনার বা ডাক্তারের সুপারিশে কাজ হবে না।

16. ফল ভোগের জন্য দেহ ধারণ করতেই হবে : শুভকর্মের ফলস্বরূপ সুখ ভোগের জন্য শরীর ধারণ করতে হয়। দেহের মাধ্যমেই ফল ভোগ হয়ে থাকে, তা শুভ বা অশুভ যে কোন ধরণের ফল ভোগ হোক না কেন। জন্ম-মৃত্যুর চক্র যতদিন চলবে ততদিন মোক্ষ প্রাপ্তি হতে পারেনা। "আর দেহ ধারণই করতে হবে না" এরূপ স্থিতিলাভের নাম মোক্ষ। যতদিন পর্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্মরাশি সঞ্চিত কর্মে জমা হয়ে আছে, তা সম্পূর্ণ রূপে ভোগ না হওয়া পর্যন্ত এই সংসার চক্রের বিরাম নেই, চলতেই থাকবে। দেহ ধারণ করাই হলো আসল বন্ধন। শুভ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ভোগ করার জন্য দেহ ধারণকে স্বর্ণ নির্মিত শিকলের এবং অশুভ কর্মফল ভোগের জন্য দেহ ধারণকে লৌহ নির্মিত শিকলের বন্ধন বলা যেতে পারে। অর্থাৎ কর্ম মাত্রই জীবের বন্ধনের হেতু হয়ে থাকে। সুপাত্রে দান করলে এর শুভফল স্বরূপ সুখ ভোগের জন্যও শরীর ধারণ করতে হবে।

"সুপাত্রদানাৎ চ ভবেৎ ধনাঢ্যো ধনপ্রভাবেন করোতি পূণ্যম।
পুণ্যপ্রভাবৎ সুরলোকবাসী পুনধর্নাঢ্যো পুনরের ভোগী।"

আর কুপাত্রে দান করলে এর ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করার জন্য দেহধারণ করতে হয়।

"কুপাত্রদানাৎ চ ভবেৎ দরিদ্রো দারিদ্র্যদোষেণ করোহতি পাপম্।

পাপপ্রভাবৎ নরকং প্রয়াতি পুনর্দরিদ্রো পুনরেব পাপী।”

উপরোক্ত দুই প্রকারেই জীব সংসার চক্রে ঘূর্ণিত হচ্ছে এবং পিষে যাচ্ছে, মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব হচ্ছে না, কেননা জীব সতত ক্রিয়মাণ কর্ম করেই চলছে। আর অনেক কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ না পেলেও তা সঞ্চিতরূপে জমা হচ্ছে। সঞ্চিত কর্মের পরিমাণ যেন হিমালয় পর্বতের মত বিশাল স্তূপাকারে জমা হচ্ছে। আর তা পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধরূপে পরিণত হচ্ছে। প্রারব্ধ ভোগের জন্য অনুকূল শরীর জীবকে ধারণ করতে হয়। এমনি ভাবে এই সংসারের ‘বিষচক্র’ অনাদি কাল থেকে শুরু করে অনন্ত কাল পর্যন্ত চলছে। মহর্ষি পতঞ্জলি ঋষি তাঁর ‘যোগ দর্শন’ গ্রন্থের সাধন পাদে ২।১৩ নং শ্লোকে বলেছেন,

“সতি মূলে তদ্বিপাকঃ জাতিঃ আয়ুঃ ভোগাঃ।”

অর্থাৎ যতদিন কর্মরূপী মূল (জড়) থাকবে ততদিন পর্যন্ত শরীররূপী বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। আর শরীর সৃষ্টি হলে জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপী কর্মফল প্রাপ্ত হবেই।

সংসারে এমন অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন, “যদি আমি তিন কুইন্টাল পাপ করার পরে পাঁচ কুইন্টাল পূণ্য করে নিই তাহলে পূণ্য থেকে পাপ বিয়োগ হয়ে দুই কুইন্টাল পূণ্যতো অবশিষ্ট থাকবেই। তাহলে আমাকে আর পাপের ফল দুঃখ ভোগ করতে হবে না।” আসলে এরূপ গণিত সম্পূর্ণ ভুল। কর্মের সিদ্ধান্তে এরূপ ভাবে কর্মফল বিয়োগ হয়না, বরং যোগই হয়ে থাকে। আপনি তিন কুইন্টাল পাপ কর্ম করলেন, আর পাঁচ কুইন্টাল পূণ্য কর্ম করলেন, তাতে আপনাকে আট কুইন্টাল কর্ম ফল ভোগ করতে হবে। আবার তিন কুইন্টাল পাপের ফল ভোগের জন্যও দেহ ধারণ করতে হবে। এমনি ভাবে পাপ-পূণ্য মিলে আট কুইন্টাল

সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য দেহ ধারণ করতে হবে।

17. তাহলে মোক্ষ কখন লাভ হবে? : প্রতিটি মানুষেরই মোক্ষ লাভ করার অধিকার রয়েছে, মানব শরীর মোক্ষলাভের জন্যই। মানব শরীর ধারণ করে মোক্ষ লাভ না হলে তাকে পুনঃ বহু যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়। কোন মানুষ যদি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন যে তিনি দেহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে পরব্রহ্মে লীন হবেন, তাহলে তিনি তো তা করতে সক্ষম, সেই স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে। কেননা তিনি পরব্রহ্মেরই অংশ। তাই মানুষ পরব্রহ্মে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই জন্মের সম্পূর্ণ প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হচ্ছে এবং পূর্বের জন্ম জন্মান্তরের জমাকৃত হিমালয় পর্বত প্রমাণ সঞ্চিত কর্মের স্তূপ পরিষ্কার বা ভস্ম না হচ্ছে ততটুকু সময় পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম হবে, দেহধারণ করতেই হবে এবং মোক্ষলাভ অসম্ভব। তাই যদি কারো মোক্ষ প্রাপ্তির তীব্র ইচ্ছা জাগ্রত হয়; তাহলে তাঁকে সকল সঞ্চিত কর্ম ধ্বংস করতেই হবে। সকল সঞ্চিত কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্ম করতে হবে এবং বর্তমান জীবনের প্রারব্ধকে সম্পূর্ণ রূপে ভোগ করে নিতে হবে। আর ইহ জীবনে এখন থেকে নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম এমনভাবে করতে হবে যাতে তা তৎক্ষণাৎই ফল প্রদান করে সমাপ্ত হয়ে যায়, যাতে একটি ক্রিয়মাণ কর্মও সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হতে না পারে, যাতে ঐ কর্ম পরিপক্ক হয়ে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য প্রারব্ধরূপে আর সন্মুখে আসতে না পারে। তাহলে দেহ ধারণ করতে হবে না।

কিন্তু কঠিন বিষয় হলো জীব সারা জীবন ধরে প্রারব্ধ ভোগ করার সাথে সাথে অসংখ্য নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম করে থাকে, আর তা ভোগ করার জন্য তাকে ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ, অসংখ্যবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়, এই

বিষ চক্রের' সমাপ্তি আর হয়না। সুতরাং সর্বপ্রথম, জীবন কাল ব্যাপী আমাকে সকল ক্রিয়মাণ কর্ম এমন কুশলতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে সেই কর্ম কখনও সঞ্চিত রূপে জমা হতে না পারে, আর ভবিষ্যতে যাতে দেহ-বন্ধন হতে না পারে। তাই যথেষ্ট। এরূপ কুশলতার সাথে কর্ম করার নামই যোগ। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগের ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৫০)

কর্মবন্ধন হতে মুক্তির উপায় বা কৌশল হলো যোগ। ক্রিয়মাণ কর্ম উক্ত উপায়ে কুশলতার সঙ্গে করার নামই যোগ।

18. কেহ যদি কর্মই না করেন তাহলে? : যদি কেহ প্রশ্ন করেন, "এই জীবনের কাল চক্রে কেহ যদি কোন কর্মই না করেন, তাহলে সঞ্চিত কর্ম জমা হবার প্রশ্ন আসবে না এবং ফলে সঞ্চিত কর্ম পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধ রূপে ভোগ করারও প্রশ্ন আসবেনা, তাই তাকে প্রারব্ধ ভোগের জন্য আর দেহ ধারণ করতে হবেনা। সুতরাং আপনা থেকেই মোক্ষলাভ হতে পারে, দেহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হতে পারে, তা ঠিক কিনা?" এর জবাব হলো এই যুক্তি সঠিক নয়। মানুষ কর্ম বিনা মুহূর্ত কালও অবস্থান করতে পারেনা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় স্পষ্টভাবে বলেছেন,

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষনমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৫)

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৮)

অর্থাৎ "কোন মানুষ এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না।"

"কর্ম না করলে শরীর নির্ব্বাহ হবেনা অর্থাৎ শরীরই টিকবেনা।"

স্নানাহার, শরীরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পান, উঠা-বসা, বলা, শয়ন, নিদ্রা, দর্শন-শ্রবণ, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, জীবন নির্বাহের জন্য চাকুরি, ব্যবসা, স্বাস্থ্যের রক্ষার যাবতীয় করণীয় কাজ ইত্যাদি সব কর্ম মানুষকে করতেই হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই কর্ম করতেই হয়। সুতরাং ক্রিয়মাণ কর্ম করার সময় তা এরূপ কৌশল বা নিপূণতার সাথে করতে হবে যাতে সেই কর্ম তৎক্ষণাৎই ফল দিয়ে শান্ত এবং সমাপ্ত হয়ে যায় এবং তা যেন আর সঞ্চিত কর্ম রূপে জমা হতে না পারে। এমনি কুশলতার সঙ্গে কর্ম করলে ঐ কর্ম দীর্ঘ সময় পরেও ভবিষ্যতে কোন সময়েই আর প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য পুনঃ দ্বিতীয়বার শরীর ধারণ করবে না। তাই মুক্তিকামী ব্যক্তিকে এরূপ ভাবেই কর্ম অবশ্যই করতে হবে, যাতে কর্ম সঞ্চিত রূপে আর জমা হতে না পারে।

19. কোন্ ক্রিয়মাণ কর্ম সঞ্চিত রূপে জমা হয়না? : নিম্নলিখিত কর্মগুলি সঞ্চিত রূপে জমা হয়না।

* শিশু তার শৈশব কালে অজ্ঞান-অবুঝ অবস্থায় যে কর্ম করে থাকে,
* না জেনে করা কর্ম,
* মনুষ্য ব্যতীত অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে করা কর্ম,
* কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে করা কর্ম,
* মানুষের সমষ্টি কল্যাণের জন্য করা কর্ম,
* নিষ্কাম কর্ম।

এবার উপরে উল্লিখিত ক্রিয়মাণ কর্মগুলি যা সঞ্চিত কর্মরূপে ফল প্রদান করেনা, তা নিম্নে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হলো।

20. (i) (ii) শিশু তার শৈশব কালে অজ্ঞান-অবুঝ অবস্থায় করা যে কর্ম করে থাকে, এরূপ কর্ম সঞ্চিত কর্ম রূপে ফল দেয় না :

তদ্রূপ ভাবে কোন ব্যক্তি বেহুস অর্থাৎ সম্পূর্ণ অচেতন, অজ্ঞান অবস্থায়, অথবা পাগল অবস্থায় বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যে কর্ম করে থাকে তাতে কোন রকম রাগ-দ্বেষ থাকেনা। সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করে যে ক্রিয়মাণ কর্ম করা হয় তা সঞ্চিত কর্ম রূপে জমা হয়না। যেমন একটি অবুঝ ছোট্ট শিশু তার হাত আগুনের মধ্যে রাখলো, হাত সামান্য পুড়ে গেল, তাতে সেই কর্ম তৎক্ষণাৎ ফল দিয়ে সমাপ্ত হয়ে গেল। মনে করুন একটি খাটের উপরে তিন মাসের একটি শিশু শয়ন করে আছে, আশে পাশে তখন কোন লোক নেই। হঠাৎ তিন বছরের এক শিশু, খাটের উপরে খেলা-ধূলা শুরু করলো, লাফালাফি করার সময় হঠাৎ ঐ তিন মাসের শিশুটির উপর পড়ে গেল এবং তার পা শিশুটির গলার উপর পড়ে চাপ সৃষ্টি হওয়ায় ছোট্ট শিশুটির তখনই মৃত্যু হলো। এই অবস্থায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে ঐ তিন বছরের শিশুটির বিরুদ্ধে কোর্টে হত্যার মামলা করা যাবে না। কেননা ঐ কর্মে তিন বছরের শিশুটির কোন প্রকার রাগ দ্বেষ বা পরিকল্পনা ছিল না। তদ্রূপ ভাবে রাগ-দ্বেষ বা ইচ্ছা রহিত কোন কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়না। নাবালকের দ্বারা জমি বা সম্পদ বিক্রয় করা দলিল কোর্টে গ্রহণ যোগ্য হয় না।

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালকের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার নেই। এ ছাড়া কেউ যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, বেহুস অর্থাৎ পূর্ণ অচেতন অবস্থায়, উন্মাদ অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অশ্লীল গালি গালাজ দেয় অথবা কোন উপদ্রব করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ই, পী, কোডের ৩২৩, ৫০৪ এর ধারা অনুসারে কোর্টে কোন মামলা পেশ করা যাবে না। ঐ লোকটির বিরুদ্ধে অধিক শাস্তি হিসাবে শুধুমাত্র এইটুকু করা যেতে পারে যে কিছুলোক একত্রিত হয়ে ওকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অতি সামান্য মারপিট দ্বারা বুঝিয়ে দিতে পারে যে ভবিষ্যতে এমন কাজ যেন আর না করে, অথবা

দয়া করে ওর অপরাধকে ক্ষমা করে দেওয়া যেতে পারে। এইরূপে ঐ লোকটির কর্মফল তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে গেল। কেননা ঐ ব্যক্তির ঐ কর্মে কারো উপর কোনরূপ রাগ দ্বেষ ছিল না বলেই তার কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হবেনা।

21. মনুষ্য ব্যতীত অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে করা কর্ম : মানব যোনি ব্যতীত অন্যান্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে শরীর দ্বারা যে কর্ম করা হয় সেই কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়না। কেননা সেই কর্ম শুধুমাত্র পূর্ব সঞ্চিত প্রারব্ধ রূপে ভোগ হয়ে দেহ ত্যাগ হয়ে থাকে, তাতে কোন নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম সঞ্চিত হয়না। ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল, পশুপাখী জন্মগ্রহণ করে শরীর দ্বারা শুধুমাত্র আবেগ বা আবেশ অনুসারে কাজ করে থাকে এবং পূর্ব প্রারব্ধ ভোগ করে থাকে এবং ক্রিয়মাণ কর্মের তৎক্ষণাৎ ফলপ্রাপ্তি করে মাত্র, ওদের কর্ম সঞ্চিত কর্মফল রূপে জমা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ একটি গাধা কাউকে লাথি মারলো, আর ঐ ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ একটি লাঠি দ্বারা গাধাটিকে ১।২ বার আঘাত করলেন। আর তাতে গাধাটির লাথি মারা রূপ কর্ম-ফল তৎক্ষণাৎ সমাপ্ত হয়ে গেল। ঐ কর্ম সঞ্চিত ফলরূপে জমা হবে না, ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার এর ফলভোগ করতে হবেনা। কোন রাস্তার কুকুর কোন ব্যক্তিকে কামড়ালে অথবা সর্প দংশনে কারো মৃত্যু হলে সেই কুকুর বা সর্পের বিরুদ্ধে ভারতীয় পেনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে কোর্টে খুনের মামলা করা যাবে না। ভারতীয় 'পেনাল কোড' শুধুমাত্র মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ কারী জীবের জন্যই প্রযোজ্য, অন্য কোন যোনিতে জন্মগ্রহনকারী জীবের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। কোন ভাল উকিলকে জিজ্ঞাসা করলে এ বিষয়ে জানতে পারবেন। কোন গরু বা মহিষ যদি কোন ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে ফসলের

ক্ষতি করে তাহলে ঐ ব্যক্তি কোন লাঠির সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সামান্য আঘাত করে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারেন অথবা ম্যুনিসিপ্যালীটির খোয়াড়ে গরু বা মহিষকে বন্ধ করে দিতে পারেন। শস্যক্ষেত্র থেকে তাড়ানোর সময় সামান্য আঘাতে ওদের তৎক্ষণাৎ কর্মফল ভোগ হয়ে গেল, কিন্তু সঞ্চিত কর্মে তা জমা হবেনা। গরু-মহিষাদি কোন ফসল নষ্ট করলে এর শাস্তি Cattle trespass Act.' অনুসারে সেই গরু মহিষের মালিকের হয়ে থাকে, কোন পশুর উপর শাস্তির বিধান নেই। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীব যথা—পশু-পাখি, পতঙ্গ, মাকড়সা, মৎস্য এবং অন্যান্য যাবতীয় জলচর, নভোচর জীবকে ভোগযোনি বলা হয়। ওহে, দেব-যোনিকেও ভোগযোনি বলা হয়ে থাকে। দেবতা তাঁদের পূণ্যফলের প্রভাবে শুধুমাত্র সুখ ভোগ করে থাকে, তাঁদের ক্রিয়মাণ কর্মের ফল সঞ্চিত কর্মফল রূপে জমা হয়না। যে জীব 'পূতপাপাঃ নির্ধূত কল্মষা' অর্থাৎ যাঁর সকল পাপ নাশ হয়ে গেছে এবং শুধুমাত্র পূণ্যই জমা রয়ে গেছে, সেই জীব দেবযোনি, ভোগযোনি লাভের জন্য স্বর্গলোকে গমন করে সেখানে দিব্য সুখ ভোগ করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে পুনঃ মর্তলোকে ফিরে আসেন। স্বর্গে অবস্থান কালে তাঁদের কোন ক্রিয়মাণ কর্মের ফল সঞ্চিত ফল রূপে জমা হয়না। এ বিষয়ে ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"তে পূণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান দিবি দেবভোগান্।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৯।২০)

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৯।২১)

অর্থাৎ সেই সকল ব্যক্তি, যাঁদের যাবতীয় পাপ নাশ হয়ে গেছে, তাঁরা

নিজ পূণ্যের ফল-স্বরূপ দেবলোক স্বর্গে গমন করে দেবতাদের বিশাল দিব্য ভোগ উপভোগ করে থাকেন। আর তাঁদের পূণ্যফল সমাপ্ত হয়ে গেলে তারা পুনঃ এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরে আসেন।

তাই দেখা যায় যে মানুষ ব্যতীত অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে যে কর্ম করা হয়ে থাকে, সেই কর্ম সঞ্চিত কর্মফল রূপে জমা হয়না।

22. কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে করা কর্ম : এরূপ কর্ম অকর্ম হয়ে যায় এবং তা সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়না। সুতরাং এরূপ কর্ম করে সেই কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পুনঃ দেহ ধারণ করতে হয়না। ফলে দেহের বন্ধন এবং জন্ম-মৃত্যু রূপ চক্রের বন্ধনে আর পতিত হতে হয়না। কোন সেশন্স জজ কোন খুনের মামলায় সঠিক বিচারে দোষী প্রমাণিত হওয়া ব্যক্তিকে ফাঁসীর সাজার নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি আইনের মর্যাদা রক্ষা করে সঠিক ন্যায় বিচার করে থাকেন। অপরাধীকে আইনের নিরিখে ফাঁসীর শাস্তির রায় প্রদান করা সত্ত্বেও তার মধ্যে এ বিষয়ে কোন কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না বলে এর জন্য তাঁকে কর্মফল ভোগ করতে হবে না। তদ্রূপভাবে যে ব্যক্তি শরীর ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্যকর্ম বা শুভকর্ম সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে করেন তাঁকে কর্ম বন্ধনে পতিত হতে হয়না। সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কর্ম করার ফলে জগতে কোন এক বা অনেক ব্যক্তির অধিক কোন ক্ষতি হলেও সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় অর্জুনকে জোর দিয়ে বলেছেন যে যাঁর মন ও বুদ্ধিতে 'আমি কর্ত্তা' এরূপ দেহাভিমান নেই, যাঁর মন-বুদ্ধি জাগতিক কোন বস্তু বা কর্মে লিপ্ত বা আসক্ত হয়না, সেই স্বার্থ ও অহংকার রহিত ব্যক্তি জাগতিক দৃষ্টিতে এই সব লোককে হনন (অর্থাৎ হত্যা) করলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি কাউকে হনন করেন না। তাই

তাঁকে কোনরূপ পাপ বা বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়না। কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য কর্ম বস্তুতঃ অকর্মই।

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি সঃ ইমাঁন্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৮।১৭)

'কর্মের প্রকৃত কর্ত্তা আমি নই', এই তত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে অনুভব করে, 'আমি কর্ম করছি' এরূপ অভিমান রহিত হয়ে, ধর্ম ও শাস্ত্রীয় মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে পালন করে, 'কর্ম করা কর্ত্তব্য' এরূপ মনে করে, নিষ্কাম ভাবে যিনি কর্ম করেন, তিনি শরীর দ্বারা অনেক কর্ম করেও তাতে আসক্ত বা লিপ্ত হননা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নিম্বিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৫।৮-৯)

[অর্থাৎ এরূপ যোগযুক্ত, কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ-গ্রহণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাস-গ্রহণ, কথা বলা, ত্যাগ-গ্রহণ, চক্ষুখোলা-বন্ধকরা ইত্যাদি কার্য করেও ইন্দ্রিয়গুলি নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হচ্ছে এরূপ দৃঢ় ধারণা করে তিনি সম্যক ভাবে অনুভব করেন 'আমি (শুদ্ধ ব্রহ্ম) কিছুই করছিনা।]

শকট (অর্থাৎ গরুর গাড়ী) কে বলদ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এর নীচে চলছে পোষা কুকুরটি। কুকুরটি হয়ত মনে করছে গাড়ীটিকে আমিই বহন

করে নিয়ে যাচ্ছি।” তদ্রূপ ভাবে বদ্ধ জীব নিজের অভিমান বশতঃ মনে করে “আমিই সব কিছু করছি”। এরূপ মনে করা ভুল, মিথ্যা প্রলাপ মাত্র। এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান রেখে কর্ম করলে তাকে কালে পুনরায় দেহ ধারণ করতেই হবে, কর্মানুসারে ফল ভোগ করতেই হবে। এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমানী আসুরিক গুণযুক্ত জীব কিভাবে প্রলাপ করে থাকে, সে সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় চার শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

“ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।”
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান সুখী।।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।।”

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৬।১৩-১৬)

[অর্থাৎ এরূপ অজ্ঞানী এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানী বদ্ধ জীব মনে করে, “আমি আজ ইহা লাভ করেছি, তারপরে এই মনোরথ পূর্ণ হবে, আমার এত ধন আছে, ভবিষ্যতে পুনরায় এত ধন লাভ করবো, অমুক শত্রুকে হত্যা করেছি, অপর শত্রুদেরকেও হত্যা করবো, আমি ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যভোগকারী, সকল প্রকার কাজে আমি সফলতা লাভ করেছি, আমি বলবান ও সুখী, আমার অনেক ধনসম্পদ ও আত্মীয় স্বজন রয়েছে, আমার সমতুল্য অন্য আর কে আছে? আমি লোক প্রদর্শনের জন্য যজ্ঞ ও দান করবো, স্ফূর্তি

করবো।" এই আসুরিক গুণ বিশিষ্ট অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, দুরাচারী ব্যক্তিরা অনন্ত কামনা-বাসনা নিয়ে অহংকার যুক্ত হয়ে সকাম কর্ম করে থাকে।]

অজ্ঞানের জন্য মোহগ্রস্ত হয়ে, মোহ জালে আবদ্ধ হয়ে, অনন্ত কামনা বাসনা নিয়ে, ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে এই সকল অত্যন্ত দুষ্ট এবং নীচ প্রকৃতির পাপী দুরাচারী জীব মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান রেখে কর্ম করে থাকে। তাদের সেই কর্ম সঞ্চিত কর্মফল রূপে জমা হয়ে থাকে। আর তা তাদেরকে অনেক জন্মচক্রে আবদ্ধ করে থাকে।

23. মানুষের সমষ্টি-কল্যাণের জন্য করা কর্ম : জাগতিক দৃষ্টিতে কোন কোন কর্ম যা আপাতঃ দৃষ্টিতে পাপ কর্ম বলে মনে হলেও তা জগতের সমষ্টির কল্যাণের জন্য হলে সেই কর্ম সঞ্চিত কর্মে জমা হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মিথ্যা কথা বলা পাপ বলে গণ্য হয়ে থাকে। অধিকন্তু মিথ্যা কথা বলার জন্য কাউকে উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়াও পাপ। তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলার জন্য প্রেরণা দিয়ে 'নরো বা কুঞ্জরো বা' এরূপ কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধে 'অশ্বত্থামা মারা গেছে' এই কথা বলতে প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিলনা। পান্ডবদের জয় হলে কোন স্বার্থ বা কমিশন তাঁর প্রাপ্তি হওয়ার ছিলনা। আসলে ব্যাপার ছিল এই—যদি যুধিষ্ঠির ঐ মিথ্যা কথা না বলতেন তাহলে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করা কঠিন ছিল, অন্যথায় সমষ্টি মানবের কল্যাণে, আততায়ী দুষ্ট জীবকে সংহার করার জন্য ভগবানের লীলা স্বরূপ ঐ ধর্মযুদ্ধে পান্ডবদের জয় হতো না। যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বললেন, তাতে

তাঁর সামান্য ক্ষতি হলো বটে, তাতে মহান সত্যবাদিতার ব্রত-রক্ষা কিঞ্চিৎ হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও এক ব্যক্তির ক্ষতিতে সমষ্টি মানবের মহান কল্যাণ হয়েছিল। ঐ মিথ্যা বলারূপ পাপ কর্মের প্রেরণাকারী ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাতে তাঁকে পাপকর্মের কোন ফলভোগ করতে হয়নি। আর তাই ঐ কর্ম সঞ্চিত কর্মফল রূপে জমা হয়ে তার পুনর্জন্মেরও কারণ হয়নি। 'বাল কৃষ্ণ' 'মাখন চোর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি দিব্য-মণিকে লীলাচ্ছলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ যাবতীয় কর্মই তিনি সমষ্টি মানবের কল্যাণে, অসংখ্য লোকের উদ্ধারের জন্য করেছিলেন। কর্মের ফল প্রাপ্তিতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনরূপ স্পৃহা বা স্বার্থ ছিলনা বলে কর্মফল তাঁকে স্পর্শ করেনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।৮)

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "সাধু (অর্থাৎ সৎ ব্যক্তিদের) উদ্ধারের জন্য, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপনার জন্য যুগে যুগে (অর্থাৎ যখন আবশ্যক) আমি আবির্ভূত হই।"

"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।৯)

"আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য (অর্থাৎ অলৌকিক)।" ভগবান পূর্ণ আপ্তকাম, তাঁর নিজের কোনরূপ স্বার্থ লাভের আবশ্যকতা নেই। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।২২-২৩)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং কর্ম যে দিব্য, অলৌকিক এর তিনটি বিশেষ কারণ লক্ষ্যণীয়। যথা—প্রথমতঃ ভগবান সাধারণ মানুষের মত নয় মাস পর্যন্ত মলমূত্রে ভরা মাতৃগর্ভে বদ্ধ হয়ে ঝুলে থেকে তারপর জন্ম গ্রহণ করেননা, তিনি স্বেচ্ছায় স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম ফল ভোগ করার জন্য তিনি দেহ ধারণ করেননা, কেননা তাঁর কোন সঞ্চিত কর্ম-দোষ নেই। আর তৃতীয়তঃ ভগবান দেহ ধারণ করে যে সকল কর্ম করে থাকেন, তা তাঁর লীলা-বিলাস মাত্র এবং তিনি যাবতীয় কর্মই মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য করে থাকেন, রাগ-দ্বেষের প্রেরণায়, ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ লাভের জন্য এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান যুক্ত হয়ে কোন কর্ম করেননা। তাই তাঁর কোন কর্মই পুনর্জন্মের কারণ হয়না। তিনি স্বেচ্ছায়, যখন, যেভাবে দেহ ধারণ করার আবশ্যকতা বোধ করেন তদ্রূপ ভাবেই দেহ ধারণ করে থাকেন। শ্রীতুলসী দাস তা বর্ণনা করে বলেছেন, "নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু।"

জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, যীশুখৃষ্ট, হজরত মোহম্মদ পয়গম্বর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাঁদের জীবনকালে শুধুমাত্র সমষ্টি কল্যাণের জন্যই কর্ম করে গেছেন, তাঁরা সবাই মুক্ত-পুরুষ ছিলেন।

24. নিষ্কাম কর্ম : নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ কামনা রহিত কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়না। আসলে সাধারণ মানুষ যে কর্ম করে থাকে, তা কোন না কোন কামনা-বাসনা, ইচ্ছা বা আশা নিয়েই করে থাকে। আর তাতে তাদের কোন দোষ নেই। আমরা পূর্বের বর্ণনায় লক্ষ্য করেছি যে মানুষ যদি কর্ম ফলের আশা, ইচ্ছা এবং কামনা না রেখেও কোন কর্ম করে তথাপি কর্ম তার ফল অবশ্যই প্রদান করবে, এটাই কর্মের অটল সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এমনও দেখা যায় যে কিছু লোক আছেন যাঁরা কর্ম করেন কিন্তু কর্মফল পেতে অনিচ্ছুক। এ কোন বিচিত্র বা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। যেমন মানুষ পাপ করে, পাপের ফল দুঃখ পেতে চায়না, চোর চুরি করে, কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করুক, তা তার পছন্দ নয়। ঘুষখোর ঘুষ খায়, কিন্তু সে ধরা পড়ে শাস্তি ভোগ করতে চায়না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তারা নিষ্কাম কর্ম করছে। মানুষ পাপকর্ম করার ইচ্ছা করে কিন্তু পাপের ফল দুঃখ ভোগ করার ইচ্ছা করেনা, শুধু মাত্র পূণ্যের ফল সুখ ভোগ করতেই ইচ্ছা করে, কিন্তু অনেকে পূণ্যকর্ম করতে ইচ্ছা না করে অধিকাংশ সময় পাপ কর্ম করতেই ইচ্ছা করে।

"পূণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্বন্তি যত্নতঃ।।"

পাপী ব্যক্তি তার পাপকর্মের ফল দুঃখ কামনা করেনা, কিন্তু পাপী ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম করে, তা বলা চলে না। যে কর্ম শাস্ত্র বিহিত, ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে করা কর্ম, রাগ-দ্বেষ রহিত, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে করা কর্ম, নিজের ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করে করা কর্ম, তা হলো নিষ্কাম কর্ম। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ২।৪৭ নং শ্লোকে বলেছেন,

"মা কর্মফল হেতু র্ভূঃ।" অর্থাৎ বাসনা রেখে কর্ম করোনা। 'অমুক কর্মে এই ফল লাভ হবে' এরূপ কামনা নিয়ে কর্ম না করে 'কর্ত্তব্যবোধে', নিজের অন্তরাত্মার প্রসন্নতার জন্য, ভগবদ্ প্রীত্যর্থে কর্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়। সাধারণ মানুষ সকালে শয্যা ত্যাগ করে সুখের খোঁজে বের হয় এবং শুধুমাত্র সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা নিয়ে কর্ম করে থাকে। কেহ দুঃখের খোঁজে, দুঃখ পাওয়ার জন্য কর্ম করেনা। কিন্তু না চাওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রারব্ধের জন্য দুঃখই লাভ করে থাকে। ভক্ত নরসিংহ বলেন,

"সুখ-দুঃখকে মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়, তা দেহের উৎপত্তির সাথে সৃষ্টি হয়ে থাকে। রঘুনাথ তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সরাতে

চাইলেও তা সরেনা।"

কিন্তু নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ ফলের ইচ্ছা না রেখে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে, রাগ দ্বেষ রহিত হয়ে, শুধুমাত্র ভগবদ্ প্রীত্যর্থে কর্ম করলে, সেই কর্মের ফল সঞ্চিত রূপে জমা হয়না এবং সেই কর্মের দ্বারা জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়না।

সূর্যনারায়ণ উদিত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকার নাশ হয়ে যায়। কিন্তু আমি যদি সূর্যনারায়ণকে বলি, "হে সূর্যনারায়ণ, আপনি গাঢ় অন্ধকারকে দূর করে আমাদের খুব উপকার করেছেন।" তখন হয়ত সূর্যনারায়ণ বলবেন, "অন্ধকারকে আমিতো দেখিনি, আমি অন্ধকার দূর করিনি, আমার উপস্থিতিতে অন্ধকার আপনা থেকেই দুর হয়ে গেছে এবং আমার সান্নিধ্য লাভ করেও যদি অন্ধকার থেকে যায়, তাহলে আমার অস্তিত্বই থাকবেনা।" সূর্যনারায়ণের কর্ম শুধুমাত্র সমষ্টি কল্যাণের জন্য, তাঁর কর্মে কোন কর্ত্তৃত্বাভিমান নেই, তিনি জগৎকে প্রকাশ করছেন। সেই কর্মের জন্য কোন পারিশ্রমিক দাবী করেননা, নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে এক মুহূর্তও বিলম্ব করে উদিত হননা। পারিশ্রমিক, পেনশন, গ্র্যাচ্যুয়িটি এসবের কামনা তাঁর নেই। শুধুমাত্র সমষ্টি কল্যাণের জন্য, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে তিনি কর্ম করে থাকেন। তাঁর এই কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়ে থাকে।

শিশুর মা নবজাতককে পালন পোষন করে থাকেন। যদি শিশুটির ১০৪ ডিগ্রী জ্বর এসে যায় তাহলে তিনি সারা রাত জেগে তার সেবা শুশ্রূষা করে থাকেন। এই অসুস্থ অবস্থায় যদি তাকে কেউ বলেন, "আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিব, তুমি শিশুটিকে স্তনপান করাবেনা এবং ওর সেবা শুশ্রূষা করবেনা। এ শিশুর বয়স বৃদ্ধি হলে, যৌবন কালে বিবাহ করে সে এবং এর স্ত্রী তোমাকে দুঃখ দিবে।" শিশুটির মা আপনার কথা মেনে নিবেন না। পুত্র বড় হয়ে তার মাকে সুখ বা দুঃখ প্রদান করবে, এরূপ ভাবনা না রেখে, তিনি নিষ্কাম ভাবে শিশুটির সেবা করে থাকেন।

পৃথিবীতে এরূপ নিষ্কাম কর্মের অনেক উদাহরণই লক্ষ্য করা যায়।

মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতন লাভ করেও কোন 'ডায়রেক্টর অফ্ প্রোহিবিশন' মদ্য পান রোধ করতে সফল হননি, কিন্তু পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ, স্বামী সহজানন্দ মহারাজ, যীশুখৃষ্ট, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কোন বেতন গ্রহণ না করেই সেই কাজ করে দেখিয়েছিলেন। তাঁরা সমষ্টি কল্যাণের জন্য, নিষ্কাম ভাবে, কোন পারিশ্রমিক, বেতন, প্রমোশন, পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি, নির্দ্দিষ্ট ছুটি, ঐচ্ছিক ছুটি এসব কিছুই দাবি করেননি। এমনি ভাবে নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এরূপ কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়না। মানুষ এরূপ ভাবে কর্ম করেও কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

প্রারব্ধ কর্মকে কী উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক, এখন এ বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

25. প্রারব্ধ ভোগ করেই তা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব : ক্রিয়মাণ কর্ম পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধ রূপে উপস্থিত হলে, তা ভোগ করতেই হয়। সারা জীবন ধরে যত প্রারব্ধ ভোগ করা নিশ্চিত হয়ে আছে, তা সম্পূর্ণ ভোগ করার পরেই শরীর ত্যাগ হয়ে থাকে, এর পূর্বে নয়। প্রারব্ধের হাত থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। কোন মহান জ্ঞানী, মহর্ষি, বিদ্বান, পণ্ডিত লোক প্রারব্ধ থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেননি। এই গ্রন্থের সাত নম্বর পয়েন্টে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

প্রারব্ধ-বশে, কর্মফল স্বরূপ যা প্রাপ্ত হবার, তা হবেই। গৃহ-বিবাদের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বনে যেতে হলো। তখন ভাই শ্রীভরতের অত্যন্ত দুঃখ হলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁকে শান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

"শুনহু ভরত ভাবি প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ।
হানি, লাভ, জীবন, মরণ, যশ, অপযশ বিধি হাত।"

হানি-লাভ, জীবন-মরণ, যশ-অপযশ এ সবই প্রারব্ধের জন্য হয়ে থাকে। ক্ষতি বা লাভ, জন্ম বা মৃত্যু, যশ বা অপযশ এসবই প্রারব্ধের কারণে পূর্ব হতেই নির্দ্দিষ্ট হয়ে তদ্রূপ ভাবে তা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

গোস্বামী তুলসী দাস অত্যন্ত নিপুণতার সাথে এই বিষয়টি তাঁর রচিত 'রামচরিত মানস' নামক রামায়ণ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। সেই গ্রন্থে সমগ্র ইতিহাস পাঠ ও পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে 'ক্ষতি এবং লাভ কিভাবে, কার হয়েছিল?' ক্ষতি হয়েছিল মাতা কৌশল্যার। স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মা কৌশল্যা তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় নিজ যুবরাজ পুত্র এবং পুত্রবধূকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হলেন। তাই ক্ষতি হলো মাতা কৌশল্যার, আর লাভ হলো শবরীর, যিনি গৃহে অবস্থান করেই ভগবানের দর্শন লাভ করলেন, শ্রীরাম তাঁর গৃহে আগমন করলেন। কৌশল্যা শ্রীরামের আপন মাতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষতি হলো, আর জাগতিক দৃষ্টিতে আত্মীয়-সম্বন্ধ না হওয়া সত্ত্বেও শবরী লাভবান হলেন।

এবার দেখুন জীবনে নব-জন্ম হলো কার আর মৃত্যু হলো কার? নব-জন্ম হলো অহল্যার, আর মৃত্যু হলো রাজা দশরথের। শ্রীরামের শুধুমাত্র শ্রীচরণের রজ-স্পর্শে অহল্যা নব-জীবন পেয়ে গেলেন, আর পরাৎপর ভগবান শ্রীরামের পিতা হওয়া সত্ত্বেও পুত্র শোকে মৃত্যু হলো রাজা দশরথের। রাজা দশরথ শ্রীরামের পিতা হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরাম তাঁর মৃত্যুকে রোধ করেননি। [ভগবান শ্রীরাম সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিলেন বলে ধর্ম মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি তা করেন নি।] দেখুন, প্রারব্ধ কত বলবান! তারপর দেখুন, যশ আর অপযশ হলো কাদের? অপযশ পেলো কৈকেয়ী। পূর্বে শ্রীরামের উপর কৌশল্যার চেয়েও কৈকেয়ীর প্রেম ছিল অধিক। অথচ তার এমন কলঙ্ক এবং অপযশ হলো যে জগতের স্ত্রী-পুরুষ সকল ব্যক্তি যখন রামায়ণ পাঠ করেন তখন কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন। কোন মানুষ নিজ কন্যার নাম কৈকেয়ী

রাখেননা। এক সময় শ্রীরামের উপর কৌশল্যার চেয়েও অধিক প্রেম কৈকেয়ীর থাকা সত্ত্বেও, তাঁর আত্মবল এতই দৃঢ় ছিল যে ভগবান শ্রীরাম 'রাক্ষস বংশের বিনাশ' রূপ নাটকের লীলা রচনায় খল-নায়িকা চরিত্রের ভূমিকা পালনের জন্য তাকেই পছন্দ করেছিলেন। মাতা কৈকেয়ী অনেক অপযশ, অপবাদ, নিন্দা এবং কলঙ্ককে সহ্য করে বিধবা হতেও রাজী হলেন। কৈকেয়ী দ্বারা যে খেলা হওয়ার ছিল সেই ভূমিকা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করেছিলেন। মাতা কৌশল্যা বা সুমিত্রাকে যদি সহযোগী খল-নায়িকার খেলা করার কাজ দেওয়া হতো তাহলেও হয়ত লোকের অপবাদ, অপমান, নিন্দা এবং বৈধব্যের কলঙ্কের কথা কল্পনা করেই ভয়ে ভীত-কম্পমান হয়ে ঐ কাজ থেকে বিরত হয়ে যেতেন। তাই ভগবানের সেই লীলা-নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের নিজ আপন মাতার চেয়েও অধিক প্রিয় কৈকেয়ী মাকে অপযশ পেতে হলো। আর ঐ নাটকে বাস্তবিক যশ লাভ হলো বানরদের। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় অযোধ্যার মিলিটারীর একটি বেটেলিয়নও কোন কাজে আসেনি। রাম-রাবণের যুদ্ধে বানর-সেনারাই যুদ্ধের বিজয় যশ নিয়ে গেল। তাই মুনি বশিষ্ঠ বলেন,

"হানি লাভ জীবন মরণ যশ অপযশ বিধি হাত।"

প্রারব্ধ অনুসারে লাভ-হানি, জীবন-মৃত্যু যা নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, তা কেহ বদলাতে পারেনা। জীবনরূপী শতরঞ্জী খেলায় (একটি খেলা বিশেষ, এতে একটি পটের উপর ৬৪টি ঘর বানিয়ে, ৩২টি গুটিকা দ্বারা এই খেলা করা হয়ে থাকে) জীব শুধু মাত্র একটি গুটি স্বরূপ, খেলার পাত্র মাত্র। এই জগৎ নাট্যশালায় জগৎ পিতা পরমাত্মা প্রত্যেক জীবকে তার প্রারব্ধ অনুসারে খেলার জন্য প্রেরণ করেন। জীব তদ্রূপ ভাবে তার নিজ নিজ প্রারব্ধ ভোগের জন্য খেলা-কর্ম করতে বাধ্য হয়ে থাকে।

অনেক মানুষ জ্যোতিষ শাস্ত্রের আশ্রয় নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ-প্রারব্ধ জানতে চেষ্টা করেন। প্রারব্ধ ভোগ করার পূর্বে যদি তা তিনি জেনেও

নেন, তথাপি প্রারব্ধ থেকে তাঁর মুক্তি লাভ সম্ভব হয়না। জ্যোতিষ-বিদ্যা এক প্রকার বাস্তবিক সত্য শাস্ত্র, তথাপি আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জ্যোতিষগণ ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন এবং অর্থ লালসায় ভুল, মিথ্যা এবং মনগড়া কথা বলে থাকেন। তাই এই জ্যোতিষ শাস্ত্রকে আজকাল বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়না।

প্রারব্ধ বশে ফল যা নিশ্চিত হয়ে আছে তা অবশ্যই ফলবতী হবে। আর এর নিমিত্ত তিন প্রকার হতে পারে। যথা-স্বেচ্ছাকৃত, পরেচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত।

26. (i) স্বেচ্ছাকৃত ফলভোগ : কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ফল ভোগের ইচ্ছা নিয়ে যখন স্বেচ্ছায় কোন বিশেষ কর্ম করেন এবং সেই কর্মের ফল ভোগ করেন তখন তাকে স্বেচ্ছাকৃত ফলভোগ বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার নিজের হাত আগুনের মধ্যে বাড়িয়ে দিল, আর তাতে তার হাত পুড়ে গেল। তা হলো স্বেচ্ছাকৃত ফলভোগের দৃষ্টান্ত।

(ii) পরেচ্ছাকৃত ফল ভোগ : কখনও কোন প্রারব্ধের ফল ভোগ অপর ব্যক্তির ইচ্ছায় হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কখনও কোন ব্যক্তি আমার কোন উপকার অথবা অপকার করার ইচ্ছা নিয়ে কর্ম করে থাকেন। আর তদনুসারে আমাকে ফল ভোগ করতে হয়। যেমন কোন ব্যক্তি দ্বেষ ভাবনা নিয়ে আমার গৃহে অগ্নিসংযোগ করলো, তাতে গৃহটি জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এখানে অপর ব্যক্তির ইচ্ছায় আমার এই প্রারব্ধ ভোগ করতে হলো।

(iii) অনিচ্ছাকৃত ফলভোগ : প্রারব্ধ আমারই পূর্ব অর্জিত কর্মফল যা আমাকে ভোগ করতে হবে। কখনও নিজের ইচ্ছায় বা অপরের ইচ্ছায় না হয়ে দৈব-যোগে তা হয়ে থাকে। যেমন হঠাৎ করে একটি বৃক্ষ বা গৃহ আমার উপর পড়ে গেল, আমি আহত হলাম। অথবা আমি ফুটপাতের উপর কোন সুরক্ষিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ ড্রাইভারের অনিচ্ছা

সত্ত্বেও একটি মোটর গাড়ীর ব্রেক ফেল হয়ে ফুটপাথের উপর চড়ে গেল এবং তাতে আমি আহত হলাম।

এরূপ ভাবে দেখা যায় যে প্রারব্ধ ভোগের বেলায় আমরা স্বাধীন নই। স্বেচ্ছাকৃত বা পরেচ্ছাকৃত অথবা দৈব-যোগে প্রারব্ধ ফল তো আমাদেরকে ভোগ করতেই হবে। কামনা-বাসনা বা রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে আমরা যে ক্রিয়মাণ কর্ম করি, এর ফল সঞ্চিত কর্মফলরূপে জমা হয় এবং তা পরিপক্ক হয়ে পুনঃ প্রারব্ধরূপে আমার সন্মুখে এসে উপস্থিত হয়।

(iv) বুদ্ধি কর্মানুসারিণী (বুদ্ধি কর্মকে অনুসরণ করে থাকে) : প্রারব্ধ ভোগ করার বিষয়ে জীব পরাধীন। তাই প্রারব্ধ অনুসারে জীবের বুদ্ধি উদিত হয়ে থাকে। প্রারব্ধ যেরূপ ভোগ করতে হবে বুদ্ধিও তদ্রূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তদ্রূপ বুদ্ধি প্রেরণা প্রদান করে থাকে। কখনও এরূপ লক্ষ্য করা যায় যে খুব প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তিও প্রারব্ধ ভোগের জন্য বিপরীত বা মন্দ বুদ্ধি উপযোগ করেছেন।

এরূপ দৃশ্য দেখে আমাদের আশ্চর্যবোধ হয় যে যিনি কারো চালাকিতে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হননি এমন কোন প্রখর বুদ্ধিমান লোক অতি সামান্য বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিভাবে পরাজিত বা আবদ্ধ হয়ে পড়েন! আসলে এরূপ ক্ষেত্রে তার প্রারব্ধই তাকে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বাধ্য করে। এর কারণ হলো তার প্রারব্ধের ফলেই ঐরূপ বুদ্ধি তখন তাকে প্রেরণা দিয়ে থাকে।

এই বিষয়টি একটি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট করা যায়। এক সাপুড়িয়ার ঘরে একটি টোকরীর (পেটিকার) মধ্যে সাপ রাখা ছিল। রাত্রিবেলায় অন্ধকারের মধ্যে একটি ইঁদুর ঐ ঘরে প্রবেশ করে ঐ পেটিকার মধ্যে কোন খাবার বস্তু বা মিষ্টি রয়েছে মনে করে সারারাত ধরে তা কাটলো, খুব পরিশ্রম ও পুরুষার্থ প্রয়োগ করে যখন ছিদ্র করলো তৎক্ষণাৎই ঐ ক্ষুধার্ত্ত সর্পটি বের হয়ে ইঁদুরটিকে ধরে খেয়ে ফেললো। সর্পটি বিনা

পরিশ্রমে ঐ আহার পেয়ে গেল। আর ইঁদুরটির ক্ষেত্রে সারারাত ধরে পেটিকা কাটার নিপুণতা এবং পুরুষার্থই ওর মৃত্যুর কারণ হলো। প্রারব্ধ অনুসারে এরূপ ভাবেই ওর মৃত্যু স্থির ছিল। অন্যদিকে বিনা চেষ্টায় সর্পটি ইঁদুরকে পেয়ে গেল, ইহাও পূর্ব নির্দিষ্ট ছিল।

"কাপে ওংদর করংডিয়ো, সাপ উন্দুরনে খায়।
উদ্যোগ অবলো পড়ে, ধনীনুং ধার্যুঁ থায়।"

অর্থাৎ ইঁদুর পেটিকা কাটে, সাপ ইঁদুরকে খায়। উদ্যোগের ফল বিপরীত হয়ে গেল। প্রভুর ইচ্ছানুসারেই এরূপ হয়ে থাকে।

ধরুন, একটি পিঁপড়ার মৃত্যু একটি মোটর গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে হবে, এরূপ প্রারব্ধ নির্মাণ হলো। পিঁপড়াটি যখন কোন বড় রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ একটি মোটর গাড়ী ওর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। পিঁপড়া অত্যন্ত ভীত হয়ে বাঁচার প্রবল ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ চলন্ত মোটর গাড়ীর চাকার দিকে ধাবিত হলো এবং তাতে পিষে ওর মৃত্যু হলো। এখানে মৃত্যু থেকে রক্ষার ইচ্ছায় মোটর গাড়ীর চাকার দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া রূপ পুরুষার্থই ওর মৃত্যুর কারণ হলো। এই ভাবেই ওর প্রারব্ধ ভোগ হলো। কেহ যদি মনে করেন যে কোন পুরুষার্থ প্রয়োগ না করে পিঁপড়াটি পূর্ব স্থানেই অবস্থান করলে বেঁচে যেতো। তা ঠিক হলেও আসলে এরূপ হওয়ার ছিলনা। কেননা প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য ওর বুদ্ধিই তখন ওকে চাকার নীচে পিষে যাবার জন্য ঐ দিকে দৌড়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছিল। 'প্রারব্ধ ভোগের জন্য বুদ্ধি কর্মকে অনুসরণ করে থাকে।' ইহা কর্মের সূত্র বা সিদ্ধান্ত। প্রারব্ধ ভোগের জন্য যেরূপ কর্ম করা আবশ্যক, বুদ্ধিও তদ্রূপ প্রেরণা জোগায়। গোস্বামী তুলসী দাস মহারাজ বলেন,

"তুলসী জৈসী ভবিতব্যতা তৈসি মিলহীঁ সহায়।
আপুনু আবাহিঁ তাহি পাহিঁ তাহি তন্থা লেই জাই।।"

যেরূপ হবে বলে স্থির হয়ে আছে, আপনার প্রারব্ধ আপনাকে শীঘ্রই

সেদিকে আকর্ষণ করবে অথবা তা আপনার কাছেই আকর্ষিত হয়ে চলে আসবে এবং যে কোন উপায়ে আপনাকে প্রারব্ধ ভোগ করিয়েই ছাড়বে, (তারপর প্রারব্ধ শান্ত হবে।)

প্রারব্ধের জন্য মহান পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বুদ্ধিও বিপরীত মুখী হয়ে যায়। পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে এসবের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

"অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে ধীয়োহপি পুংসাম মলিনীভবন্তি।।"

স্বর্ণের হরিণ হওয়া অসম্ভব, তা সত্ত্বেও শ্রীরাম ওর পিছনে ছুটেছিলেন। কেননা মারীচ, রাবণ এবং অনেক রাক্ষসদের বিনাশরূপ প্রারব্ধ যা পূর্বেই স্থির হয়েছিল, ভবিষ্যতে তা ফলবতী করার জন্য ঐরূপ একটি অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। তাই এটা সত্য যে মহান বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধি প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য সেদিকেই গমন করে থাকে।

"ন নির্মিতঃ কেন ন দৃষ্টপূর্ব ন শ্রুয়তে হেমময়ঃকুরঙগঃ।
তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।।"

ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্যে স্বর্ণের হরিণ নির্মাণ কেহ কোথাও দেখেননি, এমন কি শ্রবণও করেননি। তথাপি অন্তর্যামী ভগবান ঐ হরিণের পিছনে ছুটেছিলেন, কেননা তা করার প্রয়োজন ছিল। তাই মারীচ, রাবণ এবং অনেক রাক্ষস কুলকে বিনাশের জন্য ভগবান রামের ভাবনা সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

"কেবো হতো রাবণ তত্ত্ববেত্তা নবে গ্রহো নিকটমাং রহেতা।
হরী সীতা কষ্ট লহ্য কুবুদ্ধি বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।।"

(অর্থাৎ রাবণ মহান তত্ত্ববেত্তা ছিলেন। নব-গ্রহ তার নিকটে অবস্থান করতেন। কিন্তু মাতা সীতাকে হরণ করার কুবুদ্ধির জন্য তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেতে হলো। বলা হয়ে থাকে যে বিনাশ কালে এমন বিপরীত

বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।)

রাবণ মহান তত্ত্ববেত্তা ছিলেন, বিভিন্ন বেদের উপর তার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি ভগবান শঙ্করের পরম ভক্ত ছিলেন, পুলস্ত্য কুলের ব্রাহ্মণ ছিলেন, মহা পরাক্রমী ছিলেন, নবগ্রহ তার সেবা কাজে রত থাকতেন, বায়ুদেবতা তার মহলে ঝাড়ু দিতেন, বরুণ দেবতা তার মহলে জল ভর্তি করার কাজ করতেন। এমন তত্ত্ববেত্তা এবং শক্তিশালী রাজা হওয়া সত্ত্বেও তার বুদ্ধি বিপরীত হয়ে গেল। প্রারব্ধের বশীভূত হয়ে তার বুদ্ধি মাতা সীতাকে হরণ করার কাজে লিপ্ত হলো।

> "কেবা হ্তা কৌরবো কালজ্ঞানী (পণ) কুসংপমাং পাছী করী ন পানী।
> কপাই মুবা দ্বেষ সহিত ক্রোধী বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।"

(অর্থাৎ কালের সম্বন্ধে কৌরবদের জ্ঞান ছিল। কিন্তু কুসঙ্গের, কু-প্রভাবে, দ্বেষ এবং ক্রোধের জন্য ওদের সবকিছু বিনষ্ট হয়ে গেল। বিনাশ কালে এমন বিপরীত বুদ্ধি হয়ে থাকে।)

কৌরবরাও মূর্খ ছিলেন না। তারা গুরু দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন, যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন, ধর্ম কি এবং অধর্ম কি তা তারা জানতেন। দুর্যোধন মহাভারতে স্বয়ং স্বীকার করেছেন,

> "জানামি ধর্মং ন চ প্রবৃত্তি ঃ জানামি অধর্মম্ ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
> কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

(অর্থাৎ ধর্ম কি তা আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি-রুচি নেই, অধর্ম কি তাও আমার জানা আছে, কিন্তু তাতে নিবৃত্তি-অরুচি নেই। যেন কেহ [কামনা-বাসনা] হৃদয়ে বসে যা করাচ্ছে, আমি তাই করে চলছি।)

ধর্ম এবং অধর্মের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষের অন্তঃকরণে স্থিত সূক্ষ্ম

কামনা-বাসনা প্রারব্ধ ভোগ করানোর জন্য জীবের বুদ্ধিকে বিপরীত মুখী করে দেয়।

(৮) কর্ম বুদ্ধ্যানুসারিণম্ (কর্ম বুদ্ধিকে অনুসরণ করে থাকে) : পক্ষান্তরে, ক্রিয়মাণ কর্ম বুদ্ধিকে অনুসরণ করে থাকে। বুদ্ধি যত অধিক শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক হবে নূতন ক্রিয়মাণ কর্মও ততবেশি শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ২।৪৪ নং শ্লোকে এরূপ শুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে ব্যবসায়ত্মিকা বুদ্ধি (অর্থাৎ বিবেক সম্পন্ন, বিশুদ্ধ, সাত্ত্বিক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) বলা হয়েছে। তাই নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম করার সময় বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, আর সে সময় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যত বেশি উপযোগী হবে কর্মও তত অধিক উত্তম হবে। কিন্তু জীবের অন্তঃকরণে জন্ম জন্মান্তরের অসংখ্য কামনা বাসনা ভর্তি রয়েছে বলে তারা কামনা বাসনার বশীভূত হয়ে যায়, আর তখন তাদের বুদ্ধি তাদেরকে নূতন অনুচিত, অশাস্ত্রীয় ক্রিয়মাণ কর্ম করিয়ে থাকে যা ভবিষ্যতে তাদের সম্মুখে দুঃখ-দায়ক প্রারব্ধ রূপে উপস্থিত হয়। কিন্তু নিজের কামনা-বাসনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার স্বাধীনতা পরমাত্মা প্রতিটি জীবকে দিয়েছেন। যদি জীব সেই কামনা বাসনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে তাহলে তাঁর বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হয় অর্থাৎ বিবেক যুক্ত, বিশুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় যা জীবকে অনুচিৎ, অশাস্ত্রীয়, কুকর্ম করতে বাধা দেয় এবং ধর্ম, ন্যায়-নীতির পথে চলতে সাহায্য করে।

সুতরাং কর্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে প্রারব্ধ ভোগ করার সময় 'বুদ্ধিকর্মানুসারিণী' অর্থাৎ বুদ্ধি কর্মকে অনুসরণ করে, আর ক্রিয়মাণ কর্ম করার সময় দেখা যায় 'কর্ম বুদ্ধ্যানুসারিণম্' অর্থাৎ কর্ম বুদ্ধিকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগে যেমন কর্ম তেমন বুদ্ধি হয়। আর ক্রিয়মাণ কর্মে যেমন বুদ্ধি তেমন কর্ম হয়। প্রারব্ধ ভোগে পূর্বের কর্ম অনুসারে ব্যবহার, আচরণ হয়ে থাকে আর ক্রিয়মাণ কর্মের সময় বুদ্ধি যেমন প্রেরণা

দেয় কর্মও সেই অনুসারে হয়।

(vi) প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য গ্রহ নক্ষত্র কি সাহায্য করে থাকে? : কোন মানুষের যেরূপ প্রারব্ধ নির্মাণ হয়, তার জন্মের সময়েই ঠিক তদ্রূপ ভাবে গ্রহ নক্ষত্রগুলি নির্দ্দিষ্ট বা প্রস্তুত হয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তির সমগ্র জীবন ধরে শুভ অথবা অশুভ প্রারব্ধগুলি ভোগ করার জন্য গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলির গতি বা ক্রিয়া তদ্রূপ হয়ে থাকে। কোন ভাল, সত্যিকার জ্যোতিষ হয়ত গণনা করে কোন ব্যক্তি তার জীবনের কোন্ সময় ভাল ভাবে যাবে, কোন্ সময় মন্দ ভাবে যাবে তা জেনে নিতে পারেন এবং মন্দ অশুভ সময়ে সেই ব্যক্তি যাতে সচেতন থেকে, প্রথম থেকেই সাবধানতার সঙ্গে শুধুমাত্র শুভকর্মে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে পারেন, সেজন্য কল্যাণকারী পথ-দর্শন জ্যোতিষ তাকে বলে দিতে পারেন। তাই এ বিষয়ে ভীত হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই।

রাহু, কেতু, গুরু, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগুলি খুবই পবিত্র, নীতিমাণ, প্রামাণিক কার্যে কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা কর্মের বিধি-বিধান মেনে কার্য করেন, কর্মের মর্যাদা রক্ষা করে জীবের শুভ-অশুভ প্রারব্ধ ভোগ করতে সাহায্য করেন। এই কয়েকটি গ্রহ উচ্চস্তরের প্রামাণিক, মান্য-অধিকারী, তাঁরা বর্তমান জগতের দুর্নীতিগ্রস্ত উচ্চাধিকারীদের মত লোভী বা ঘুষখোর নন।

প্রারব্ধ অতি বলবান। আপনি সারা জীবন ধরে যদি প্রতি মঙ্গলবারে এক বেলা মাত্র ভোজন করেন, প্রতি শুক্রবারে কেবল চানা খেয়ে থাকেন, শনিবারে শুধু ওড়দের (কলাইয়ের) ডাল খেয়ে থাকেন তথাপিও প্রারব্ধ আপনাকে ভোগ করতেই হবে। তবে ব্রত উপবাস করলে ঐ সময় জীব পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকেন, এইটুকুই তাঁর লাভ। কিন্তু এই গ্রহ-নক্ষত্র জীবকে তার প্রারব্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেনা।

কেহ চুরি করলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে। তবে কর্মরত ঐ পুলিশ

যদি ঐ ব্যক্তির পূর্ব পরিচিত বা কোন সম্বন্ধ যুক্ত হয় তাহলে হয়ত লাঠির আঘাত একটু কম করতে পারে, চোরের অনুরোধে হয়ত তাকে ধূম্রপান করতে দিতে পারে, এতটুকুই। কিন্তু তাকে ছেড়ে দিতে পারেনা। আর যদি ঘুষ খেয়ে পুলিশ চোরকে ছেড়ে দেয় তাহলে তার চাকুরী যাবে অথবা ভবিষ্যতে একদিন তাকে মন্দ ও অশুভ ফল ভোগ করতে হবে।

এই গ্রহ-নক্ষত্রগুলি মান্যতা প্রাপ্ত, সৎ, উচ্চ-অধিকারী (শাসক)। তাঁদের উপাসনা করলে আপনার প্রারব্ধ ভোগের সময় তাঁরা সামান্য মানসিক শান্তি আপনাকে দিতে পারেন, কিন্তু আপনাকে প্রারব্ধ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি দিতে পারেননা। আপনি তাঁদের উপাসনা করে সাত্ত্বিক বৃত্তি অবলম্বন করলে প্রারব্ধ আপনার উপর হয়ত তেমন শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা, এতটুকুই মাত্র লাভ হবে। কিন্তু আপনি যদি অনবরত পাপ কার্য করেই চলেন, আর ভাড়া করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ডেকে এনে তাদের ভাল দক্ষিণা দিয়ে গ্রহ-জপ করান, তাতে গ্রহগুলি আপনার কৃত পাপ-কর্মের প্রারব্ধ ভোগে কোনরূপ অনুকূলতা সৃষ্টি করতে পারবেনা। গ্রহ-নক্ষত্রকে এরূপ অনুচিত, শুধু প্রদর্শন মূলক শ্রদ্ধা, সুপারিশ বা ঘুষ দেবার অর্থাৎ তোষামোদ করার ভাবনা আপনি কখনও করবেন না।

যদি হনুমানজীকে আপনি এরূপ প্রার্থনা করেন, "হে হনুমান বাবা, আপনি আমাকে একশ ড্রাম তেল কাল পথে (অন্যায় উপায়ে) অনায়াসে প্রাপ্ত করে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে তা থেকে এক ড্রাম তেল আপনার চরণে নিবেদন করে দিব।" তখন হনুমানজী হয়ত আপনাকে এরূপ বলবেন, "আমি তোর এমন বাবা-চাচা হতে চাইনা।" তাই আপনি দেবতার উপর এরূপ লোক দেখানো শ্রদ্ধা রেখে মিথ্যা কাজে আবদ্ধ হবেন না।

সহজ সরল রাস্তায় চললে কোন অধিক মন্দ স্বভাবের পুলিশ কর্মচারীও তাঁকে দুঃখ কষ্ট দিতে পারেনা। আর যে ব্যক্তি রাস্তায় কারো কিছু চুরি করে সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি পুলিশের ভয়ে ভীত

হবে এবং পুলিশও তাকে ধরতে চেষ্টা করবেই, এতো স্বাভাবিক ব্যাপার।

মনে করুন আপনি আহম্মদাবাদ থেকে বোম্বে ট্রেন যাত্রা করার সময় রিজার্ভেশন টিকিট নিয়ে ট্রেনে চড়েছেন। তাহলে আপনি সারারাত শয়ন করে সুখে আপনার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু বিনা টিকিটে বসলে যতবার ট্রেন পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আসবে তখনই আপনি চিন্তিত হবেন, কামরায় কোন যাত্রী চড়লেই তাকে টি, টি মনে করে ভীত হবেন, আপনি ভয় ও চিন্তা শূন্য হতে পারবেন না। তাই দেখা যায় যে পাপ কর্ম হতে বিরত হলেই শান্তি লাভের আশা।

আপনার সম্মুখে কোন প্রারব্ধ উপস্থিত হলে তা স্বেচ্ছায় প্রেম ও প্রসন্নতার সঙ্গে স্বীকার করে ভোগ করে নেওয়া উচিত। কেননা প্রারব্ধ তো আপনারই কৃত ক্রিয়মাণ কর্মের পরিণাম বা ফল। সুতরাং প্রারব্ধ থেকে পরিত্রাণের জন্য কোন আঁকা-বাঁকা পথ অবলম্বনের চেষ্টা না করাই উত্তম। যাঁরা শুভকর্মে প্রবৃত্ত ও নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা প্রারব্ধকে প্রসন্নতার সাথে ভোগ করার জন্য আত্মবল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

27. 'ভগবদ নাম স্মরণ', 'রামনাম জপ' ইত্যাদি দ্বারা প্রারব্ধ ভোগে কোন পরিবর্ত্তন হয় কী? শাস্ত্র এবং সন্তগণ বলেন যে ইষ্টদেবের স্মরণ এবং ভগবদ্ নাম—জপ জীবের প্রারব্ধ ভোগে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে থাকে। ভবসাগরে, সংসার চক্রে জীব আবদ্ধ হয়ে আছে, 'রাম-নাম' তা থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে, সাধু সন্তগণ তাই বলেন। সংসারের জীব ভবরোগ দ্বারা বিশেষ ভাবে রোগগ্রস্ত, পীড়িত। রামনাম, ভবরোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য মহৌষধ। রামনাম রামবাণ স্বরূপ। রাম নাম ঔষধ যেন আয়ুর্বেদিক ঔষধ। এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করলে সেই সঙ্গে সঠিক পথ্য, আহার সংযম ইত্যাদির বিশেষ আবশ্যকতা নেই। ইঞ্জেকশান নিলেন, বড়ি খেলেন, আর সেই সাথে মরিচ, তেঁতুল ইত্যাদি সেবন করলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আর্য়ুবেদিক চিকিৎসায় সঠিক পথ্য, কঠোর সংযম

(অর্থাৎ হানি কারক, অহিতকর আহার গ্রহণ না করা) অবশ্যই আবশ্যক। তা পালনে সামান্য ত্রুটি হলেও সেই ঔষধ কোন না কোন ভাবে শরীরের বাইরে চলে যায় এবং এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। এলোপ্যাথিক ঔষধ শারীরিক ব্যথা বা অন্য কোন রোগকে সাধারণতঃ চেপে রাখে। রোগ যদিও তৎক্ষণাৎ উপশম হয় কিন্তু তা জড়-মূলের সাথে নাশ হয়না। অন্যদিকে আয়ুর্বেদিক ঔষধ গ্রহণের বেলায় যদি সঠিক পথ্য এবং সংযম পালন করা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে রোগ জড়-মূলের সাথে নাশ হয়ে যায়।

তদ্রূপ ভাবে 'রাম নাম'ও অমোঘ রামবাণ সদৃশ, আয়ুর্বেদিক ঔষধের মত। জীবতো ভবরোগে রোগগ্রস্ত, সেই রোগ জড়-মূলের সাথে নাশ করলে জীবকে আর পুনঃ প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হতে হবেনা, মোক্ষ লাভ হবে। কিন্তু এর জন্য কঠোর সংযম পালন করার আবশ্যকতা রয়েছে। একজন ভক্ত কবি এই সুপথ্য অর্থাৎ সংযম পালনের বিষয়ে একটি সুন্দর সূচীপত্র প্রস্তুত করে উল্লেখ করেছেন,

"হরি কা নাম রসায়ন সেবে, কিন্তু অগর পরহেজ কা পালন ন হো।
সো নাম রটন কা ফল মিলে নহীঁ, ঔর ভবরোগ নিবৃত্ত হো নহীঁ।।"

1. প্রথম পরহেজ (সুপথ্য/সংযম) হলো অসত্য না বলা।

2. কারো নিন্দা না করা।

3. নিজের প্রশংসা না করা, শ্রবণও না করা।

4. কোন প্রকার ব্যসন অর্থাৎ বদ-অভ্যাস না রাখা।

5. অপরের ধন-সম্পদকে মাটি-পাথরের মত তুচ্ছ জ্ঞান করে তা কখনও গ্রহণ না করা।

6. পরস্ত্রীকে মাতার সমান মনে করে কখনও কু-দৃষ্টি না করা।

7. 'আমি খুব সাধন-ভজন করছি' এরূপ ভাব প্রকাশ, প্রচার না করা, অর্থাৎ নিজের সাধন-ভজনের বিষয় সদা-সর্বদা গোপন রাখা।

৪. 'আমি মহান, সবাই আমাকে সম্মান পূজা করুক'-এরূপ অহংকার, অভিমান ত্যাগ করা।

ঐ ভক্ত কবি সাধনায় সুপথ্য অর্থাৎ সংযম সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত বড় যে একটি তালিকা দিয়েছেন, এসকল পথ্যগুলি অথবা এগুলির একটি পথ্যও যদি কোন সাধক সঠিক রূপে, দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করেন তাহলে তাঁর নামজপের রামবাণ ঔষধ কার্যকরী হবে এবং তিনি প্রারব্ধ ভোগের সময় অনেকাংশে শান্তি লাভ করবেন। কিন্তু আপনার, আমার অনুভব রয়েছে যে উপরোক্ত পথ্যগুলির একটিও আমরা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে ইচ্ছুক নই, জগতে কোটি জীবের মধ্যে হয়ত একজন মাত্র তা পালন করছেন। আবার এও সত্য যে উল্লিখিত পথ্যগুলি পালন করা না হলে সারাজীবন 'রামনাম' জপ করলে বা লিখলেও সবই যেন নিরর্থক হবে, মাত্র লোক-দেখানো এরূপ কাজে মানুষের মধ্যে অনেক সময় ভণ্ডামি, কপটতা, মিথ্যাচার ইত্যাদি এসে যায় এবং তাতে তার ক্ষতিই হয়। শ্রদ্ধাশূন্য রামনাম গ্রহণে জীব উদ্ধার হয়না, হলে রাম নামের টেপ রেকর্ড বা গ্রামোফোন রেকর্ড সর্বপ্রথম উদ্ধার হয়ে যেতো। অনেক লোক সারা জীবন ধরে 'রাম-নাম' নিচ্ছেন অথচ তারা ব্যবহার, আচার-আচরণে উপরোক্ত কোন সংযম পালন করছেন না বলে তাঁদের মুক্তিলাভ হচ্ছেনা এবং হবেও না।

জনৈক ভক্ত কবি 'আখা ভগত্' সত্যই বলেছেন,

"তিলক করতাং ত্রেপন বহ্যাং, জপ মালানাং নাকাং গয়াং
কথা সুনী সুনী ফূট্যং কান তোয ন আব্যুং ব্রহ্মজ্ঞান।
এক মূরখনে এবী টেব পত্থর এটলা পূজে দেব
তুলসী দেখী তোড়ে পান, পাণী দেখী করে স্নান।"

অর্থাৎ "তিলক করতে করতে ৫৩ বছর চলে গেল। জপ মালার ছিদ্রও বড় হয়ে গেছে, কথা শ্রবণ করতে করতে কান বধির হয়ে গেছে, তবুও

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলোনা। এক মূর্খ ব্যক্তির এমন অভ্যাস ছিল যে কোন পাথর দেখলেই তা ভগবান মনে করে পূজা শুরু করতেন, বৃক্ষের কোন পাতা দেখলেই তা তুলসী-পত্র মনে করে উঠিয়ে নিতেন, আর কোন স্থানে জল দেখলেই তাতে স্নান করতে শুরু করতেন।"

তথাপি তার ভবরোগ নাশ হলোনা। এর কারণ হলো সেই ব্যক্তি উপরোক্ত সংযম পালন করেননি, করলে তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভ করতে পারতেন। তাই বলা হয়ে থাকে যে সংযমরূপ পথ্য গ্রহণ করা না হলে শুধুমাত্র ঔষধ সেবনের তেমন কোন সার্থকতা নেই। কেননা তাতে ঔষধ সঠিকভাবে ক্রিয়া করবেনা, কোন উপকার হবে না। আর উপরোক্ত সংযম সঠিকরূপে পালন করলে রামনাম নেওয়া বা না নেওয়া দু'ই প্রায় সমান। ভগবানের কৃপা সকল জীবের উপর বর্ষিত হচ্ছে। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, গাধা, পিঁপড়া, মাকড়সা প্রভৃতি জীব-জন্তু রামনাম জপ করতে পারেনা, তবুও ভগবানের কৃপা এসব জীব-জন্তুর উপরও সমান ভাবে রয়েছে।

তারপর ঐ ভক্ত কবি অপর এক অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠিন সংযমের কথা বলেছেন,

"হুঁ হরিনো, হরি ছে মম রক্ষক, এহ্ ভরোসো জায় নহী।
জে হরি করিশে তে মম হিতনুং, এ নিশ্চয় বদলায় নহীঁ।"

অর্থাৎ "আমি হরির, হরিই আমার রক্ষক, এই ভরসা যেন সদা আমার থাকে, হরি যা করবেন সবই আমার কল্যাণের জন্য, এই দৃঢ় নিশ্চয় যেন বদলে না যায়, যেন তা সদা বজায় থাকে।"

28. প্রারব্ধ ভোগে ভগবান কী সহায়তা করেন? : উপরে দেখানো হয়েছে ক্রিয়মাণ কর্ম কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে নিষ্কাম কর্মযোগ সাধককে সহায়তা করে এবং প্রারব্ধ কর্ম কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে ভক্তিযোগ সহায়তা করে। একথা সত্য যে ভগবানকে ভক্তি করলে প্রারব্ধ ভোগ করার সময় যথেষ্ট শান্তি পাওয়া যায়। শাস্ত্র এবং সাধু সন্তগণ এর সাক্ষ্য (প্রমাণ)

প্রদান করেন। কিন্তু ভগবানকে ভক্তি কিরূপে করা যায়, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

ভগবানের নির্দেশ মত চলা, কাজ করাকে ভক্তি বলে। আমি আমার পিতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, তাঁর প্রশংসা ও গুণানুবাদ অন্যের নিকট প্রকাশ করি, শুধুমাত্র একেই শ্রদ্ধা-ভক্তি বলা যাবে না। যদি আমি তাঁর কথামত না চলে তাঁর নির্দেশ অমান্য করি, তিনি আমাকে পড়তে বসার জন্য নির্দেশ দিলে তা পালন না করে দুষ্টুমী শুরু করি, তাহলে আমি পিতাকে যে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি তা মান্য হবেনা। তাতে বরং তাঁকে অবজ্ঞা করা হবে, তাঁর উদ্বেগ সৃষ্টি করা হবে, এটাই প্রমাণিত হবে।

তদ্রূপ, আমি যদি ভগবানের নির্দেশ মত না চলে শুধুমাত্র তাঁর নাম স্মরণ করি, গুণানুবাদ বর্ণনা করি, নিজের কপালে চন্দন তিলকাদি লেপন করে মন্দিরে দর্শন করতে যাই এবং শুধু এসব কাজকেই ভগবদ্ ভক্তি মনে করি তাহলে তা সঠিক ভগবদ্ ভক্তি হবে না। শুধু সারা রাত ধরে মঞ্জীরা বাজালেই ভক্ত হওয়া যায়না। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ ভক্তের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ভগবান এমন কথা বলেননি যে মাথায় চার ফিট লম্বা শিখা রাখবে, দেড় ফিট লম্বা দাড়ী রাখবে, ধূতী এবং যজ্ঞোপবীত পরিধান করবে তাহলে আমার ভক্ত বলে গণ্য হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন,

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।
"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১২।১৩-১৪)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণীর প্রতি দ্বেষভাব রহিত, সকলের প্রতি

মিত্রভাব (প্রেম-ভাব) রাখেন, দয়ালু, মমতা ও অহংকার রহিত, সুখ-দুঃখে সমান ভাব রাখেন, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, ভগবানে দৃঢ় নিশ্চয়মনা, মন এবং বুদ্ধি ভগবানের প্রতি সমর্পিত, এমন যোগী ভগবানের প্রিয় ভক্ত।

ভক্তের এই সকল লক্ষণগুলি উল্লেখ করে ভগবান বলেছেন যে উক্ত লক্ষণগুলি যাঁদের মধ্যে রয়েছে তাঁরা ভগবানের ভক্ত এবং প্রিয় ব্যক্তি। আমার মধ্যে যদি এই লক্ষণগুলির একটি লক্ষণও অনুপস্থিত থাকে তাহলে আমি ভগবানের ভক্তরূপে গণ্য হতে পারিনা, ভগবানের প্রিয় হতে পারিনা।

আমি যদি ঘোষণা করি, "আমি বিড়লা শেঠের পুত্র", তাহলে বিড়লা শেঠের আর্থিক সম্পদের কোন অংশ প্রাপ্ত করতে পারবোনা। কিন্তু বিড়লা শেঠ স্বয়ং যদি দাঁড়িয়ে সকলের সন্মুখে ঘোষণা করেন যে আমি তাঁর পুত্র, তাহলে তাঁর আর্থিক অংশের ভাগ আমি পাবো। তদ্রূপ ভাবে ভগবান স্বয়ং যদি বলেন, "যো মদ্ ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।" অর্থাৎ ভগবান যদি স্বীকার করেন যে এই ব্যক্তি আমার ভক্ত, আমার প্রিয়', তাহলে তা সঠিক হবে।

ভগবানের নির্দেশ মত ভক্তের লক্ষণগুলিকে যদি আমি ধারণ করি শুধুমাত্র তা হলেই আমি তাঁর ভক্ত বলে গণ্য হবো, তাহলেই আমিও নরসিংহ দেব, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তদের মত প্রারব্ধ ভোগের সময় ভগবানের সাহায্য (কৃপা) লাভ করতে পারবো।

তথাপি ভগবানতো জগত-পিতা। ভাল-মন্দ, ভক্ত-অভক্ত প্রভৃতি সকল জীবের প্রতিই ভগবানের কৃপা, করুণা এবং দয়া রয়েছেই, কেননা তিনি দয়ার সাগর।

আমার পিতা যা নির্দেশ দিবেন, তা পালন করা কর্ত্তব্য। আর কোন কাজ করতে নিষেধ করলে তা করা উচিত নয়। নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে বারান্দার উপরে কোন স্থানে চড়ে লাফালাফি করতে

গিয়ে যদি আমার পা ভেঙ্গে যায়, তথাপি আমার উপর পিতার দয়া থাকবে। তিনি তখন হয়ত আমাকে কোন অস্থি বিশেষজ্ঞের নিকট নিয়ে যাবেন। রিক্সাভাড়া দিবেন, অস্থি বিশেষজ্ঞকে ফিস্ প্রদান করবেন, তারপর আমাকে গৃহে নিয়ে এসে কোমল বিছানায় শয়ন করিয়ে সেবা শুশ্রূষাও করবেন, ঔষধ খাওয়াবেন, অর্থব্যয় করে মোসাম্বী ইত্যাদি খাওয়াবেন এবং আমি যাতে উদ্বিগ্ন না হই এরূপ শান্ত্বনা বাক্য বলবেন। কিন্তু আমি যদি তখন তাকে প্রার্থনা করে বলি, "বাবা, আমার পায়ে ভীষন ব্যথা হচ্ছে, আপনি তা নিয়ে স্বয়ং ভোগ করুন।" তাহলে পিতা আমার পায়ের সেই ব্যথা নিতে পারবেন না, তাতো আমাকেই ভোগ করতে হবে।

তদ্রূপভাবে, কোন মানুষ যখন ভগবানের নির্দেশ অমান্য করে কুকর্ম করে থাকে এবং সেই কর্মের ফল পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধ রূপে তার সন্মুখে উপস্থিত হয় তখন সেই প্রারব্ধতো তাকে স্বয়ং ভোগ করতেই হবে। এই কর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়নে জগৎ পিতা ভগবান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। স্বয়ং ভগবান রাম, পরাৎপর ব্রহ্ম হয়েও তিনি তাঁর নির্গুণ, নিরাকার স্বরূপ ত্যাগ করে সগুণ সাকার স্বরূপ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তদ্রূপ আচরণও করেছিলেন। ভগবান রাম স্বয়ং বলেছেন,

> "যৎ চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি যৎ চেতসা ন কলিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
> প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্তী সোহহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী।"

অর্থাৎ "যে দিবস আমি চক্রবর্তী রাজা হয়ে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলাম ঐ দিবসই প্রভাত কালে কর্মের সিদ্ধান্তকে সম্মান করে আমি জটাধারী তপস্বীর বেশে বনে গমন করলাম।" রাজা দশরথ ছিলেন ভগবান শ্রীরামের পিতা। পুত্রের বিয়োগে মৃত্যুরূপী প্রারব্ধকে ভোগ না করার

জন্য ভগবান তাঁকে পর্যন্ত সহায়তা করেননি, তার আয়ুষ্কাল কমপক্ষে চৌদ্দ বছর বৃদ্ধি করেননি। যে রামচন্দ্রের শুধুমাত্র চরণ রজের স্পর্শে পাথর রূপী অহল্যা জীবন লাভ করেছিলেন, সেই ভগবান স্বয়ং তাঁর পিতা দশরথকে জীবন দান করেননি। এর কারণ হলো রাজা দশরথের পাপ ভোগ করার সময় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রাজা দশরথ ঋষি পুত্র শ্রবণকে বধ করেছিলেন। সেই পাপ পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধ রূপে ফল দেবার জন্য রাজার সন্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। ভগবান স্বয়ং তাতে হস্তক্ষেপ করেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় স্পষ্ট ভাবে বলেছেন,

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৫।১৪-১৫)

অর্থাৎ বস্তুতঃ ভগবান প্রাণীদের না কর্ত্তৃত্ব, না কর্ম, না কর্মফল-সংযোগকে রচনা করেন, কিন্তু জীবের নিজের স্বভাব (প্রকৃতি)ই তাকে কর্মে প্রেরিত করে। ভগবান পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তাই তাঁকে বিভুঃ বলা হয়। তিনি কারো পাপ অথবা পুণ্যকে গ্রহণ করেন না। মায়া দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় সকল জীব মোহিত হয়ে থাকে।

গর্ভণর (শাসক/আইন প্রণেতা) রাষ্ট্রের আইন কানুন সৃষ্টি করেছেন যে রাস্তায় যান-বাহন সর্বদা নিজের বাঁ দিকে চালাতে হবে। কিন্তু যদি স্বয়ং গভর্নর নিজের মোটর গাড়ীটি ডান দিকে চালিত করেন, তাহলে তখন ছোট থেকে ছোট একজন ট্রাফিক পুলিশও তাঁর গাড়ীটিকে রোধ করতে পারেন, তাতে গভর্নরের কোন ক্ষমতা কার্যকরী হবেনা। তদ্রূপ ভাবে ভগবানের সৃষ্ট বিধি-নিষেধ সঠিক রূপে পালন হোক, তা তিনি চান। তাই মানুষকে ভগবানের শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের নির্দেশ মত,

ভক্তিযোগ দ্বারা নিজ প্রারব্ধকে প্রসন্নতার সাথে ভোগ করে নেওয়াই কর্ত্তব্য।

29. ভগবানের নিকট আমরা সাধারণত কী পেতে চাই? : ভগবানের নিকট আমরা সঠিক ভাবে চাইতে পারিনা। আমরা ভগবানের নিকট এরূপ প্রার্থনা করে থাকি, "হে ভগবান, আমি পাপ কর্ম করেছি, আর তাই এর ফল স্বরূপ দুঃখ-কষ্ট আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু আপনি এমনটি করুন আমাকে যেন ফল ভোগ করতে না হয়।" এমন অনুচিত প্রার্থনা ভগবান স্বীকার করবেননা। প্রারব্ধ যাতে ভোগ না হয়, সেজন্য ভগবানকে প্রার্থনা করা ঠিক নয়। জগতে মহান ভগবদ্ ভক্তগণ নিজ প্রারব্ধের জন্য আসা দুঃখ কষ্টকে প্রেম পূর্বক, প্রসন্নতার সাথে ভোগ করে গেছেন। জাগতিক দৃষ্টিতে ভক্তকে বাহ্যভাবে সামান্য দুঃখিত হতে দেখলেও বস্তুতঃ তা নয়, তাঁরা প্রারব্ধ স্বরূপ দুঃখকে প্রসন্নতার সাথে বরণ করে নেন। কুন্তীমাতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসীমা। তাঁকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। অথচ তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছেন—

'বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ।'

অর্থাৎ "সব সময় আমার দুঃখ কষ্ট বর্তমান থাকুক;" আমরা ভগবানের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিনা। কিন্তু দেখুন, শ্রী নরসিংহ মেহ্‌তা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, "হে ভগবান, আমার অস্তিত্ব নাশ হয়ে যাক্।" নরসিংহ মেহ্‌তা, মীরাবাঈ, কুন্তী-মাতা এসকল মহান ভক্তগণ জাগতিক ও বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে গেছেন। নরসিংহ মেহ্‌তার পুত্রের মৃত্যু হলো, আর পুত্রী বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলো, স্ত্রীর মৃত্যু হলো, নরসিংহ্ মেহ্‌তাকে 'জাতি-বর্ণ' থেকে বহিষ্কার করা হলো। মীরাবাঈ স্বামীর নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, দেবর তাঁকে বিষ পান করালো। স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দুরারোগ্য ব্যাধিতে পীড়িত হলেন,

শারীরিক কত কষ্ট ভোগ করলেন! তথাপি এই মহান ভক্তগণের ভক্তি কখনও কিঞ্চিৎ মাত্র হ্রাস হয়নি। তাঁরা প্রারব্ধ থেকে মুক্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেননি।

একদিন একজন চক্রবর্তী রাজা এক অত্যন্ত দরিদ্র ভিখারীকে ডেকে বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি আমার নিকট চাইতে পারো, যে পরিমাণ ধন-সম্পদ চাইবে তাই তোমাকে দান করে দিব।" কাঙাল, ভিখারীটি রাজাকে বললো, "আমার ভিক্ষা-পাত্রটি ভেঙ্গে গেছে, একটি নূতন পাত্র দিন।" রাজা তো শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভাবলেন, "আহা! ভিখারী চাইতে জানেনা।" যদি সে অপরিমিত সম্পত্তি, প্রচুর ধন- সম্পদ যাচ্ঞা করতো তাও রাজা তাকে দান করতে প্রস্তুত ছিলেন। অথচ সেই দুর্ভাগ্যবান ভিখারী শুধুমাত্র একটি নূতন ভিক্ষা-পাত্র চাইলো।

আমরাও ভগবানের নিকট তুচ্ছ বস্তু প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে থাকি। তাই ভগবান আমাদের উপর সন্তুষ্ট নন। আমরা ভগবানের নিকট অধিক থেকে অধিক কি চাই? হয়ত পাঁচ-পচিশ লাখ টাকা, পাঁচ-পঁচিশটি বাংলো, মোটর গাড়ী, পাঁচ পুত্র, সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে থাকি। এই সব প্রার্থনা যেন ঐ ভিখারীর নূতন ভিক্ষা পাত্র চাওয়ার মত।

কুন্তীমাতা এবং ভক্ত নরসিংহ মেহ্‌তা ভগবানের নিকট যা চেয়েছিলেন, এরূপ চাওয়া আমাদের মনে জাগ্রত হয়না। না চাওয়া সত্ত্বেও পরমাত্মা মোক্ষের দ্বার-স্বরূপ এই মানব দেহ আমাদেরকে দিয়েছেন। আর এর সদ্ উপযোগ কিভাবে করে আমরা মোক্ষ লাভ করতে পারি এ বিষয়ে ভগবান শাস্ত্র এবং সাধু-সন্তদের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত অধার্মিক, বদ্ধ-জীব, নিজের যথার্থ স্বার্থ কি তা বুঝিনা। আর তাই আমরা প্রারব্ধ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুচ্ছ জাগতিক বস্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে থাকি। তাতে ভগবান অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। বাস্তবিক

আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

30. আমরা সঞ্চিত কর্ম থেকে কিরূপে পরিত্রাণ পেতে পারি? : উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা গেল যে কর্মযোগ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কর্ম করেও কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আর ভক্তিযোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম প্রসন্নতার সাথে ভোগ করে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। কিন্তু অতিশয় গম্ভীর (গূঢ়) বিষয় হলো ক্রিয়মাণ কর্ম করার ব্যাপারে সকল মানুষই স্বাধীন। ক্রিয়মাণ কর্ম নিজ হস্তেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মানুষ যদি তা করতে ইচ্ছা করে, তাহলে অবশ্যই তা করতে পারে। প্রারব্ধ কর্মফল তো বুক ফুলিয়ে উপস্থিত হবেই। তা ইহ জীবনে ভোগ করে শেষ করা যেতে পারে। আর সঞ্চিত কর্মতো পরিপক্ক হয়ে ফল দেবার জন্য এখনও প্রস্তুত হয়নি। তা যতক্ষণ পরিপক্ক না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেনা। কিন্তু যে ক্রিয়মাণ কর্ম ইতঃপূর্বে হয়ে গেছে, এর ফল আর ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

একবার যে থুথু ফেলে দেওয়া হয়েছে তা আর পুনঃ মুখে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। একবার যে বাণী বলা হয়ে গেছে, তা আর কণ্ঠে ফিরিয়ে নেওয়া চলেনা। যেমন কিনা একবার বন্দুক থেকে গুলি বের হয়ে গেলে তা আর বন্দুকের মধ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তদ্রূপ ভাবে এক সময় যে ক্রিয়মাণ কর্ম হয়ে গেছে, যা ইতিমধ্যে সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হয়ে গেছে, তা পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধরূপে সম্মুখে উপস্থিত হবেই, ভোগ করা বিনা তা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। তাই এরূপ সঞ্চিত কর্মকে ভোগ করার জন্য পরবর্তী জন্মে দেহ ধারণ করা বিনা তা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। পরবর্ত্তী জন্মে তা ভোগ করার পরেই এর সমাপ্তি হবে।

অনাদি কাল থেকে অনেক জন্মের অসংখ্য কোটি সঞ্চিত কর্ম, যা হয়ত হিমালয় প্রমাণ, তা জীবের পিছনে পড়ে আছে, আর পরিপক্ক হয়ে যাবার সাথে সাথেই জীব তা প্রারব্ধ ফল রূপে ভোগ করতে থাকে, আর তাতেই যে তা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে যায়, তা নয়। তাহলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এই সঞ্চিত কর্মের পরিমাণ এতই অধিক যে অনন্তকাল পর্যন্ত তা জীবকে জন্ম- মৃত্যুর চক্রে ঘুরাতেই থাকবে। তাহলে জীবের মোক্ষ লাভ একেবারে অসম্ভব হয়ে যাবে, যতক্ষণ

পর্যন্ত দেহ ধারণ করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোক্ষ লাভ হবে কিরূপে? বেদান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বলছে, "এরূপ পরিস্থিতিতে বিচলিত হবার আবশ্যকতা নেই।"

জীব দৃঢ় ইচ্ছা করলে এই বর্তমান জীবন কালেই তার অনেক সঞ্চিত কর্ম রাশিকে নাশ করতে পারে। এর জন্য একটি উত্তম উপায় রয়েছে। বিশাল পাহাড়প্রমাণ কাষ্ঠ রাশি যেমন একটি মাত্র দিয়াশলাইয়ের দ্বারা অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ হয়ে যায়, তদ্রূপ পর্বত পরিমাণ সঞ্চিত কর্ম-রাশি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্ম হয়ে যায়। 'জ্ঞানাগ্নি' বিনা বিশাল পাহাড় পরিমাণ সঞ্চিত কর্মকে নাশ করার দ্বিতীয় বা বিকল্প কোন উপায় বা পথ নেই।

কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগের গুরুত্বও অপরিসীম। জীব যেমন নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তেমনিই ভক্তিযোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্মকে প্রসন্ন চিত্তে ভোগ করে নিতে পারে। আর তদ্রূপ ভাবে জ্ঞান-যোগ দ্বারা অনাদি কাল থেকে অনেক জন্ম জন্মান্তরের একত্রিত হওয়া সঞ্চিত কর্ম- রাশিকে ভস্মসাৎ করতে পারে। আর এমনি ভাবে নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ দ্বারা প্রতিটি জীব মাত্রই তার সমস্ত ক্রিয়মাণ প্রারব্ধ এবং সঞ্চিত কর্ম থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করতে পারে। তাই ইহ জীবনেই মোক্ষলাভ অবশ্যই সম্ভব। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত সঞ্চিত কর্ম রাশিকে জ্বালিয়ে একেবারে ভস্ম করে দিয়ে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় স্পষ্ট বলেছেন,

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।৩৭)

অর্থাৎ যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি মোটা-পাতলা, শুকনা-ভিজা, গোল-লম্বা, ছোট-বড় সর্ব প্রকার কাঠকে ভস্ম করে দেয়, তদ্রূপ ভাবে জ্ঞানরূপ অগ্নি শুভ-অশুভ, ক্রিয়মাণ, প্রারব্ধ এবং যাবতীয় সঞ্চিত কর্মকে জ্বালিয়ে ভস্ম

করে দেয়। আর জীব তখন মোক্ষ লাভ করে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ করে।

31. জ্ঞানাগ্নি কিরূপে প্রকাশ হয়ে থাকে? : জীব নিজের আসল স্বরূপকে ভুলে গেছে, বস্তুতঃ জীব ব্রহ্মেরই অংশ। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ। তাই জীবও সৎ, চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু জীবের সেই জ্ঞানানুভব নেই বলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৫।৭)

অর্থাৎ "এই জীবলোকে জীবাত্মা আমারই সনাতন অংশ।" জীব ব্রহ্মের অংশ এবং মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মায়ার বশীভূত হয়ে যেন বন্ধন দশায় পতিত হয়েছে।

নিজ স্বরূপের যথার্থ, সম্যক্ অনুভব হওয়াকে জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞান হবার সাথে সাথেই যাবতীয় সঞ্চিত কর্ম জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। কিন্তু জীবের এই স্বরূপ-জ্ঞান হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কোন সামর্থ্যবান সৎগুরু প্রাপ্ত হলেই জ্ঞান লাভ হতে পারে।

একটি সিংহ-শাবক কোন কারণে জন্মের পরেই মায়ের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। একজন মেষ-পালক ঐ নবজাতক সিংহ শাবকটিকে ভেড়ার দলের সাথে রেখে পালন পোষন করতে লাগল, শাবকটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল। কিন্তু শৈশব থেকে ভেড়ার পালের মধ্যে থেকে চলা ফেরা করার জন্য অজ্ঞানতা বশে সে নিজেকে এক ভেড়াই মনে করতো। একবার একটি সিংহ ঐ ভেড়ার পালের পাশে পৌঁছলে সিংহকে দেখে সকল ভেড়াই পালিয়ে গেল। তা দেখে সিংহটি আশ্চর্য হয়ে ভাবলো, "মেষের পালের মধ্যে আমার জাতির এই সিংহের বাচ্চা ভেড়ার মতই পালিয়ে যাচ্ছে কেন?" সিংহ সব ভেড়াগুলিকে যেতে দিল, কিন্তু সিংহের

বাচ্চাটিকে ধরে ফেললো। সিংহের বাচ্চা বলল, "দাদা, আমি মেষ, আমাকে হত্যা করোনা।"

সিংহ বললো, "ওরে ভাই, তুই মেষ নও, আমার জাতির সিংহের বাচ্চা, আমাকে ভয় পাচ্ছিস কেন? তোকে আমি মেরে খাবো না।" কিন্তু সিংহের বাচ্চাটি সে কথা বিশ্বাস না করে ভীত হয়ে বলতে লাগলো, "আমি মেষ, আমাকে মেরোনা।"

তখন সিংহ ঐ বাচ্চাটিকে এক পুকুরের পাশে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই পুকুরের জলে আমার এবং তোর নিজের মুখ দেখ, দেখবি একই রকম। আমি গর্জন করছি, তুই এরূপ গর্জন কর।" তখন ঐ বাচ্চা সিংহের মত গর্জন করলো, তাতে তার নিজের আসল স্বরূপের জ্ঞান হয়ে গেল এবং ভয় মুক্ত হয়ে সে সিংহের সাথে চলে গেল। ঠিক একই রকম অবস্থা জীবের।

যেমন কিনা সূর্য থেকে সূর্য-কিরণ পৃথক হয়ে সমগ্র জগত আলোকিত করছে, তদ্রূপ জীবও অনাদি কাল থেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আকাশে মেঘের সঙ্গে যে জল থাকে তা সম্পূর্ণ পরিস্কার এবং স্বচ্ছ জলে (distilled and crystel water) বাদলের মধ্যে ক্ষোভ (প্রতিক্রিয়া) সৃষ্টি হলে জলের ফোঁটা পৃথক হয়ে পৃথিবীতে পতিত হয়। আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হওয়ার সময় জলের সাথে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মিলিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর মাটির স্পর্শে ঐ জল-বিন্দু মলিন হয়ে পড়ে। এরূপ অনেক জল-বিন্দু একত্র মিলিত হয়ে নদীর সৃষ্টি হয়। আর পৃথিবীর অনেক ক্ষারীয় ও মলিন পদার্থ একত্র মিলিত হয়ে তা সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়। তাই সমুদ্রের জল ক্ষারযুক্ত (লোনা) হয়ে থাকে। আবার সেই সমুদ্রের জল যখন সূর্যের প্রখর কিরণের তাপে বাষ্প (evaporation) হয়, তখন তা উর্ধ্ব গতি লাভ করে বাদল রূপে নিজের আসল স্থান এবং স্বরূপে পৌঁছে পবিত্র হয়ে উঠে। তদ্রূপ ভাবে জীব ব্রহ্ম থেকে

পৃথক হয়ে গেছে জগতের মায়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে, অবিদ্যার জন্য মলিন (অর্থাৎ বদ্ধ জীব) হয়ে গেছে।

গোস্বামী তুলসীদাস রামায়ণে এই বিষয়টি এক লাইনে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

"ভূমি পরত ভা ডাবর পানী। জীমী জীব হী মায়া লপটানী।"

জীব যদি সিংহের মত কোন সামর্থ্যবান সৎগুরু প্রাপ্ত হন তাহলে সিংহের বাচ্চা রূপী জীব (অর্থাৎ যোগ্য শিষ্য) তাঁর যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান লাভ করে যাবতীয় কর্ম-ভয় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

গোস্বামী তুলসীদাস রামায়ণে লিখেছেন,

"ঈশ্বর অংশ জীব অবিনাশী, চেতন অমল সহজ সুখরাশী।
সো মায়া বশ ভয়ও গোঁসাই, বধ্যো কীর মর্কট কী নাইঁ।"

"ওরে, তুমি মেষ নও, সিংহের বাচ্চা। তুমি সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপ। এই দেহ তোমার স্বরূপ নয়," এই জ্ঞান কোন সৎগুরু সম্যক্ রূপে করালে তুমি মুক্তি লাভ করবে। নিজের আসল স্বরূপের জ্ঞান হওয়া মাত্রই যাবতীয় সঞ্চিত কর্ম তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যায়। এই কথা সকলের জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকলেই সম্যক অনুভবের মাধ্যমে তা প্রমাণিত করতে পারেন। সকলের জন্যই তা সিদ্ধ অর্থাৎ প্রযোজ্য।

এক ব্যক্তি রাত্রি বারটা পর্যন্ত তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলে নিদ্রিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি স্বপ্ন দেখতে পেলেন। তিনি স্বপ্নের মধ্যে এক ব্যক্তিকে খুন করেছেন, তাতে তিন বছর পর্যন্ত মামলা চললো, তারপর বিচারের রায়ে তার দশ বছর স্বশ্রম শক্ত জেল-ভোগের সাজা হলো, তাকে কারাগারে রাখা হলে জেলের ব্যবস্থাপক প্রতিদিন তার পিঠে চাবুক মারতো, পিঠে প্রতিদিনই রক্তাক্ত হয়ে যেতো। এমনি ভাবে তিন বছর দণ্ড ভোগ হলো।

একদিন জেলের ব্যবস্থাপক ক্রোধিত হয়ে কারাগারের মধ্যে এমন

জোরে চাবুকের আঘাত করতে লাগলো যে ঐ ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে 'বাপরে বাপ্', বলে চিৎকার করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে তার নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে ঐ স্বপ্নটি দেখলেন। রাত্রি ১২ থেকে ১২$\frac{১}{২}$ টা পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন।

ঐ ব্যক্তির স্ত্রী পাশেই শয়ন করেছিলেন। স্ত্রী স্বামীর চিৎকারে নিদ্রা থেকে জেগে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে?" লোকটি বললো, "আমার পিঠে তাকিয়ে দেখ, কেমন রক্তাক্ত হয়ে গেছে।"

স্ত্রী বললেন, "তুমিতো বিছানায় শুয়ে আছ, তোমার পিঠ সম্পূর্ণ ঠিক আছে, কিছুইতো হয়নি।"

লোকটি স্বপ্নাবস্থা থেকে জাগ্রত অবস্থায় আসাতে নিজের সত্যিকার স্বরূপের জ্ঞান হলো যে তিনি খুনী নন, বাস্তবিক নির্দোষ ব্যক্তি। লোকটি স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের সকল কথা খুলে বললেন। তিনি বললেন, "খুনের মামলায় তিন বছর মামলা চলেছিল, কোর্টে বিচারের রায়ে দশ বছর স্বশ্রম শক্ত জেল হলো, তিন বছর সাজা ভোগ করেছি।" তার স্ত্রী বললেন, "রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আমরা কথা বলেছি, এখন ঘড়িতে বাজে ১২$\frac{১}{২}$ টা। তুমি ৩ + ৩ = ৬ বছর কোথায় গিয়ে ফিরে এসেছো?

স্বপ্নের মধ্যে ঐ ব্যক্তির দশ বছরের শাস্তি হয়েছিল, তিন বছর সাজা ভোগ করেছে, বাকী রয়েছে আরও সাত বছর। প্রশ্ন হলো এই সাত বছরের সাজা কে ভোগ করবে? স্বপ্নাবস্থা থেকে জাগ্রত হওয়ায় ঐ সাত বছরের সাজা স্বরূপ জেল ভোগ তাকে করতে হবেনা, জাগ্রত হবার ফলে সেই সাজা নাশ হয়ে গেল। তদ্রূপ ভাবে আত্মজ্ঞান হলে সঞ্চিত কর্ম তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয়ে যায়। কেননা তখন স্বরূপে জাগ্রত হওয়ায় তার যথার্থ স্বরূপ-জ্ঞান হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ভগবান বলেছেন

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।৩৭)

অর্থাৎ "জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্বপ্রকার কর্মকে ভস্মসাৎ করে দেয়।"

স্বপ্নাবস্থার সুখ-দুঃখ স্বপ্নাবস্থায় সত্য বলে ভাসিত হয়। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের সুখ-দুঃখ মিথ্যা হয়ে যায়। তদ্রূপভাবে জাগ্রত অবস্থায় সুখ-দুঃখ ইত্যাদি জাগ্রত অবস্থায় সত্য বলে ভাসিত হলেও জ্ঞানাবস্থায় তা মিথ্যা হয়ে যায়। এক ব্যক্তি রাত্রে ক্ষীর-পুরী, অন্যান্য মিষ্টান্ন পেট ভরে খেয়ে শয়ন করলো, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে "আমি ক্ষুধার্ত, ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছি" বলে সারারাত একটি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষা মেগে চলেছে, এমন সময় যদি স্বামী শংকরাচার্য স্বয়ং এসেও তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন, "তুমি ক্ষুধার্ত নও, ভোজন করে শয়ন করেছো।" তথাপি সে তখন তা স্বীকার করবেনা। কেননা তখন সে জাগ্রত নয়, স্বপ্নাবস্থার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হবে তখন তার সঠিক স্বরূপের জ্ঞান হবে। আমাদের এই জাগ্রত অবস্থার মধ্যেও আমরা অবিদ্যার জন্য স্বরূপ জ্ঞান রহিত অবস্থায় রয়েছি বলে তা যথার্থ জাগ্রত অবস্থা নয়। শাস্ত্র এবং সম্যক্ অনুভবকারী সাধু সন্তগণ চিৎকার করে বলছেন, "এই জগত মিথ্যা এবং একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তুমি ব্রহ্মের অংশ, সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ।" তথাপি আমরা দুর্ভাগ্যবান জীব, তা স্বীকার করছিনা। এর কারণ হলো এই জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা জ্ঞানাবস্থায় আসিনি। এই বিষয়ে স্বামী শংকরাচার্য মহারাজ অনেক গ্রন্থের সার কেবল অর্ধ-শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন,

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা গেল যে স্বপ্নের দশ বছরের সাজা তিন বছর ভোগ করার পর জাগ্রত অবস্থায় সঠিক জ্ঞান হওয়ায় বাকী সাত বছরের সাজা যেমন তৎক্ষণাৎ সমাপ্ত হয়ে যায়, তদ্রূপ ভাবে জীব বস্তুত

যে সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ; এই সম্যক জ্ঞান লাভ হলে তার অনাদিকাল থেকে একত্রিত হয়ে থাকা অনেক জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম রাশিও তৎক্ষণাৎ নাশ হয়ে যায়।

ক্রিয়মাণ কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন নিষ্কাম কর্মযোগ আবশ্যক, আর প্রারব্ধকে প্রসন্নতার সাথে, অনায়াসে ভোগ করার জন্য ভক্তিমার্গ সহায়ক, তদ্রূপভাবে সঞ্চিত কর্মকে ভস্ম বা সমাপ্ত করার জন্য জ্ঞান মার্গও প্রয়োজন। জীব কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান-যোগ এই তিন যোগ-পথ অবলম্বন করেই বর্তমান জন্মের জীবনযাত্রা পূর্ণ করে অবশেষে মোক্ষ অবশ্যই লাভ করতে পারেন এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

32. (i) জ্ঞান লাভ (জ্ঞানের প্রকাশ) হয়না কেন? : সংসারে যতদিন পর্যন্ত আসক্তি থাকে, ততদিন পর্যন্ত জ্ঞান লাভ হয়না। জ্ঞান মার্গে নিজ দেহ, ধন, বৈভব, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি ত্যাগ করতেই হবে। শাস্ত্র এবং সাধু-সন্তগণ বলেন, "অজ্ঞানের জন্য আপনি পূর্ব জন্মের মাতা-পিতা, স্ত্রী- পুত্রাদিকে যেমন ভুলে গেছেন তদ্রূপভাবে এই জন্মের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদিকে জ্ঞান এবং বিবেক বৈরাগ্যের সহায়তায় ভুলে যান।"

আপনি অজ্ঞানের জন্য বিগত অনেক জন্মের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদিকে ভুলে গেছেন। তা আপনার উপর ভগবানের পরম কৃপা বলে মনে করবেন। যদি তা না ভুলতেন তাহলে হয়ত রাস্তায় চলছে কোন গাধাকেও আপনি গলায় জড়িয়ে ধরে বলতেন, "এই তো আমার পূর্ব জন্মের কাকা, এইতো আমার মামা।" আপনার বিগত জন্মের স্ত্রী হয়ত বর্তমান জন্মে কোন কুকুরী (কুত্তী) অথবা গাধী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। আপনি যদি তাকে আপনার গৃহে নিয়ে আসেন তাহলে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় (জটিল সমস্যার বিষয়) হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভগবানের অত্যন্ত কৃপা যে আপনি

বিগত জন্মের সম্বন্ধ অজ্ঞানের জন্য ভুলে গেছেন। তা খুব ভালই হয়েছে। আপনি পূর্ব জন্মের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদিকে অজ্ঞানের জন্য যেমন ভাবে ভুলে গেছেন, তেমনভাবে এই জন্মের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদিকেও সজ্ঞানে ভুলে যান (তাদের প্রতি আসক্তি পূর্ণ রূপে ত্যাগ করুন)। সংসারে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করেও আপনি আসক্তি যতটুকু দূর করবেন, আপনার মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশও ততটুকু প্রকাশিত হবে।

সংসারে আপনি আসক্ত, না বিরক্ত হয়ে অবস্থান করছেন, তা জানার জন্য আপনার নিকট যেন বেরোমিটার যন্ত্র রয়েছে। আপনি একা থাকা অবস্থায় যদি আপনার 'একা বোধ' হয় এর নাম আসক্তি, আর তখন এরূপ 'একা-বোধ' না হয়ে 'একতা-বোধ' (ভগবানের সঙ্গে) হয়, তাহলে এর নাম বিরক্তি। এই 'বেরোমিটার দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করতে পারবেন যে আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসরের জন্য আপনি যথার্থ অধিকারী কিনা?

(ii) আপনি জ্ঞান লাভের জন্য বাস্তবিক আগ্রহী কী? জ্ঞান-লাভের চেষ্টা কখনও করেছেন কী? : সত্যিকার অর্থে আমরা জ্ঞান-অন্বেষণ করিনা। আমরা হয়ত শ্রী ডোংরেজী মহারাজ বা শ্রী কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী বা শ্রী শম্ভু মহারাজের ভাগবত-সপ্তাহ-অনুষ্ঠানে অনেকবার গিয়েছি, অথবা হয়ত সন্ন্যাস আশ্রমে ভীড়ের মধ্যেও আজকাল প্রতিদিন গমন করে থাকি। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান লাভের জন্য আমরা অনেকে যাইনা। শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য অথবা মনোরঞ্জন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য সেখানে গমন করে থাকি। সেখানে অবস্থান সময়েও মন-চিত্ত গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তা ও ঝামেলার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে জ্ঞানলাভ আমাদের কিভাবে হতে পারে?

আপনি হয়ত বাজারে গমের কোন দোকানে গেলেন, কিন্তু সাথে কোন থলি নিয়ে যাননি। আপনাকে খালি হাতে দেখে ব্যবসায়ী তৎক্ষণাৎই বুঝতে পারবেন যে গম ক্রয় করার উদ্দেশ্যে আসেননি, কেবল দাম জানতে

এসেছেন। তাই বাজারে তখন বিশ কিলো গমের দাম ত্রিশ টাকা হলে সেই চতুর ব্যবসায়ী আপনাকে হয়ত আঠাইশ টাকা বলে দিবেন, কেননা তিনি জানেন যে বস্তুতঃ আপনি গম ক্রয় করার জন্য আসেননি। তারপর আপনি অন্যান্য ৪।৫টি দোকানে গিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করলেন। সেখানে গম-বিক্রেতাগণ হয়ত আপনাকে বিশ কিলো গমের দাম ত্রিশ টাকা বললেন। তাতে আপনার এরূপ বিশ্বাস হবে যে প্রথম ব্যবসায়ীর কাছে যোগ্য দামে গম পাওয়া যাবে।

এক সপ্তাহ পরে হয়ত পুনঃ আপনি হাতে বড় একটি থলি নিয়ে গম ক্রয়ের জন্য ঐ প্রথম ব্যবসায়ীর নিকট গেলেন। ঐ ব্যক্তি তখন বুঝতে পারবেন যে আপনি সত্যিই গম কিনতে ইচ্ছুক। তাই তিনি তখন হয়ত আপনাকে বিশ কিলো গমের দাম বত্রিশ টাকা বলবেন। তখন যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, "কি ভাই, আপনি তো প্রথমে আঠাইশ টাকা দাম বলেছিলেন, এখন বত্রিশ টাকা বলছেন কেন?" তখন হয়ত ব্যবসায়ী মৃদু হেসে জবাব দিবেন, "আঠাইশ টাকা দামের গমতো বিক্রি হয়ে গেছে, ৩।৪ দিন থেকে মালের অভাব দেখা দেওয়াতে দাম বেড়ে গেছে।" তখন হয়ত তার কথায় বিশ্বাস করে ঐ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ঠগে গিয়ে দু'টাকা অধিক দামে গম ক্রয় করে নিবেন।

আপনি হয়ত দই ক্রয়ের জন্য এক দোকানে গেলেন। তখন দই-বিক্রেতা হয়ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন, "দই কিসে নিয়ে যাবেন? কোন পাত্র এনেছেন কি?" দেখুন দই ক্রয় করতে গেলেও পাত্র নিয়ে যেতে হয়, সেই সাথে ঐ পাত্রটি শুদ্ধ-সঠিক এবং পরিস্কার হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় দই খারাপ হয়ে যাবে।

সিংহের দুধের জন্য স্বর্ণ নির্মিত পাত্র হওয়া আবশ্যক, মাটির পাত্র হলে চলবে না, তা ফেটে যাবে। তদ্রূপভাবে, জ্ঞান আহরণের জন্য কোথাও গেলে জ্ঞান ধারণের জন্য শুদ্ধ-পাত্র অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারা

নির্মল হয়েছে এমন শুদ্ধ অন্তঃকরণ আবশ্যক হবে। যতদিন পর্যন্ত দেহ, গাড়ী-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি রয়েছে, অন্তঃকরণে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের কামনা-বাসনা পূর্ণ রয়েছে, চিত্ত কামিনী কাঞ্চনের রঙ্গে রঞ্জিত রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত শুদ্ধজ্ঞান লাভ হতেই পারে না।

"জ্ঞান ন টকে বৈরাগ্য বিনা করিয়ে কোটি উপায়।"

অর্থাৎ "বিবেক-বৈরাগ্য বিনা কোটি উপায় অবলম্বন করলেও জ্ঞান টিকেনা, স্থির হয় না।"

জ্ঞান কাকে বলে? তা প্রথমে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া অবশ্যই আবশ্যক। শুধুমাত্র বি. এ., এম.এ, এম.কম., এল.এল.এম. অথবা সি. এ. পাশ করলে তাকে জ্ঞানী বলা যাবে না। আমেরিকার অনেক নদীর নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারলে বা রাশিয়ার সকল পর্বতের নামগুলি জেনে নিলে অথবা আফ্রিকার সকল বনগুলির ক্ষেত্র-ফল কণ্ঠস্থ করে নিলে বা অস্ট্রেলিয়ার সকল স্বর্ণখনির উৎপাদনের পরিমাণ জেনে নিলে অথবা ইংলন্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের সংবিধানের বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকলে তাকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায়না। এসব তো শুধু এক প্রকার তথ্য বা সংবাদ মাত্র।

জ্ঞানের লক্ষণ কি, জ্ঞানলাভের সাধনা বা উপায় কি? এ বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ১৩ অধ্যায়ে ৭-১১ এই পাঁচটি মাত্র শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।

মযি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৩।৭-১১)

(অর্থাৎ অভিমান, অহংকার ও দম্ভরহিত, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্য-গুরুর সেবা, শৌচ (ভিতর-বাহির শুচিতা), অন্তঃকরণের স্থিরতা, মন-ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ ও নিগ্রহ, সকল প্রকার ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতিতে দুঃখ এবং দোষ দর্শন করা, পুত্র, স্ত্রী-গৃহ ধনাদিতে অনাসক্তি ও মমতাশূন্য, প্রিয়-অপ্রিয় প্রাপ্তিতে সদাই সমচিত্ত এবং সন্তুষ্ট, ভগবানের প্রতি অনন্য যোগ ও ভক্তি, নির্জন স্থানে অবস্থান, বিষয়াসক্ত মানুষের প্রতি অতি প্রেম না করা, সদা অধ্যাত্ম-জ্ঞানে (নিত্য-অনিত্য-বিবেক জ্ঞানে) স্থিত থাকা, তত্ত্বজ্ঞানে অবস্থিতি (সর্বত্র এক পরমাত্মাকে দর্শন—এই গুলি হলো জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধন)। আর এর বিপরীত যথা—মান, দম্ভ, হিংসা ইত্যাদি অজ্ঞান (এবং অজ্ঞান বৃদ্ধির কারণ)।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় পাঁচ শ্লোকে উপরোক্ত যে সকল সৎ-গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তা যাঁদের মধ্যে রয়েছে তাঁরা জ্ঞানী, আর যাদের মধ্যে তা নেই, তারা অজ্ঞানী।

এরূপ জ্ঞান লাভের জন্য শুদ্ধ বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণের আবশ্যক। এই জ্ঞান লাভের জন্য সতত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে মোক্ষ লাভ করা কর্ত্তব্য। ইহাই কর্মের সিদ্ধান্ত বা সূত্র।

যথার্থ শ্রোতা ছিলেন রাজা পরীক্ষিত, যাঁর মৃত্যু নিশ্চিতরূপে ছিল অতি সন্নিকটে, আর বক্তা ছিলেন ত্যাগ বৈরাগ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি, মহান জ্ঞানী শ্রী শুকদেব মহারাজ। মাত্র সাত দিন শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান-কথা

শ্রবণ করে শ্রোতা মুক্তি লাভ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে এমন মহান শক্তি ভরা রয়েছে যে আজও তা মাত্র সাত দিনে জীবকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু বক্তা শ্রী শুকদেবজীর মত মহান আত্মজ্ঞানী হওয়া আবশ্যক, আর শ্রোতাকে শ্রী পরীক্ষিতের মত বৈরাগ্যবান হওয়া প্রয়োজন।

আমরা অনেকে বহুবার ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করে কথা-শ্রবণ করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার ও আপনার আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি, মুক্তি লাভ হয়নি, হচ্ছেও না। এর কারণ হলো হয়ত ভাগবত বক্তা বুদ্ধিহীন অথবা আমরা শ্রোতা বুদ্ধিহীন। আজকাল অধিকতর ভাগবত বক্তা-বেচারাগণ পাঁচ'শ বা হাজার টাকায় কন্ট্রাক্ট (ঠিকা) নিয়ে ব্যাস-পীঠে বসেন। তারা সারাদিন ভাগবত পাঠ ও কথা বলার সময় হয়ত কত কলা, কত নারিকেল, কত টাকা ভাগবতের উপর প্রণামী রাখা হয়েছে, কত ধূতি ও কাপড় এসেছে, এসবের উপরই তাদের মন-চিত্ত লেগে থাকে। আজকালের অধিকাংশ ভাগবত বক্তা-বেচারাদের এরূপ করুণ দশা! ভাগবত বক্তার যখন এরূপ অবস্থা তাহলে ভাগবত কথার যজমানের (মুখ্য আয়োজকের) স্থিতি যে আরও করুণ এবং শোচনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমান সময়ে কোন যজমান কথা শ্রবণের জন্য আসন বিছিয়ে তাতে স্থির হয়ে বসে ভাগবত কথা শ্রবণ করার কোন সুযোগই পাননা। কত আত্মীয়-স্বজন, কতজন মেয়ে এবং জামাতা এসেছেন এবং তারা কয়জন বাড়ী ফিরেছেন, ভোজন তৈরি করতে কী পরিমাণ বেসন, কী পরিমাণ তেল ব্যবহার করা হলো, এ সবের হিসাব করে চিন্তায় বেচারা একেবারে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে সাত দিনে সম্পূর্ণ শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েন, শ্রোতা রূপে স্থির আসনে বসার অবসর কোথায় তার?

আজকাল ভাগবত কথায় বক্তা এবং মুখ্যশ্রোতা যজমানের যখন এরূপ করুণ দশা সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা কাকে, কিভাবে মোক্ষ প্রদান করবেন

তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। অন্যথায় শ্রীমদ্ভাগবত তো আজও পূর্ণ শক্তি রাখে শুধুমাত্র পরীক্ষিতের মত জীব নয়, বরং ঘোর পাপী ধুংধুকারীর মত পতিত ভূত-প্রেত, পিশাচও মুক্তি লাভ করতে পারে।

আত্মজ্ঞান লাভ হওয়া এবং যাবতীয় কর্মকে ভস্মসাৎ করা নিঃসন্দেহে কোন সহজ কাজ নয়, কিন্তু তা অবশ্যই সম্ভব। এর জন্য আবশ্যক প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করা।

33. মুক্তি লাভের জন্য অন্তরায় কী ? : Physical rule অর্থাৎ ভৌতিক বা পদার্থ বিদ্যার নিয়ম অনুসারে অপর কোন বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন স্থির বস্তুর উপর বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে কাজ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সর্বদাই স্থির হয়ে অবস্থান করে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে কোন গতিশীল পদার্থের উপর গতি অবরোধক কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি না করলে ঐ গতিশীল পদার্থ সহজাত বা স্বাভাবিক ভাবে গতিশীল থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এই সূত্রকে 'Inertia-theory' অর্থাৎ 'স্থিতি-সাতত্য সূত্র' বলে থাকেন।

কিন্তু শূন্যের দিকে গতিমাণ কোন পদার্থ সর্বদাই শূন্যের দিকে গমন করেনা। এর কারণ হলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোন পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। এর ফলে কোন গতিশীল পদার্থের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়ে শেষে শূন্য হয়ে যায় এবং শেষে ঐ পদার্থ পৃথিবীর উপর পতিত হয়ে থাকে।

এই একই নিয়ম আধি-ভৌতিক বিজ্ঞানেও কাজ করে থাকে। নিজের ভৌতিক আকর্ষণ নিজ-চৈতন্যকে আকর্ষণ করে থাকে। এই আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুর নয়, এই আকর্ষণ হলো নিজের ভৌতিক বিষয়াসক্তির আকর্ষণ। এই বিষয়াসক্তির জন্য আমরা যেন এক ভার স্বরূপ হয়ে গেছি। স্ত্রী, পুত্রাদি, গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি ভৌতিক বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আসক্তি, মোক্ষ মার্গের দিকে আমাদের গতিকে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। আসক্তির আকর্ষণে মন বিষয়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার ফলে জীবের না তো

মোক্ষ প্রাপ্তি হচ্ছে, না তো ঊর্ধ্বগতি হচ্ছে। তাই বিষয়াসক্তিই জীবকে মোক্ষ লাভের জন্য বাধা ও অবরোধ সৃষ্টি করছে।

34. (i) কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞান যোগ : পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার জন্য তিনটি প্রধান উপায় বা মার্গ রয়েছে। যথা—কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ। যে ব্যক্তি যে মার্গের উপযুক্ত বা অধিকারী তাকে সেই মার্গই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্জুন ছিলেন কর্মমার্গের অধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় যে অর্জুন সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও যুদ্ধ করার সময় ভগবান তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁকে কর্ম মার্গেই নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যদিকে বিদুরজী ছিলেন ভক্তি মার্গের অধিকারী। মহাভারতের যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তীর্থ যাত্রায় গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর উদ্ধবজী ছিলেন জ্ঞান মার্গের অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উল্লেখ রয়েছে যে ভগবান তাঁকে জ্ঞান মার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন। আয়ুর্বেদিক বৈদ্য রোগীর নাড়ী দেখে কোন রোগীকে হয়ত উপদেশ দিয়ে বলেন, "আপনাকে শুধুমাত্র দই খেয়ে থাকতে হবে, অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করা চলবে না।" আবার অন্য কোন রোগীর নাড়ী দেখে পরামর্শ দিয়ে বলেন, "আপনাকে সামান্যও দই খাওয়া চলবে না, দই খেলে আপনার মৃত্যু হবে।" তদ্রূপ ভাবে অধিকারী হিসাবে যে ব্যক্তি যে মার্গের উপযুক্ত তিনি সেই মার্গ অনুসরণ করলে তাঁর কল্যাণ হবে। অবশেষে তিন মার্গই এক হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথমে এই তিনটি মার্গের যে কোন একটি মার্গ অবলম্বন করে সন্মুখে অগ্রসর হলে পরিশেষে এক পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই বলা হয়েছে,

"সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।"

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কোন ব্যক্তি আহম্মদাবাদ থেকে বরোদা হয়ে ট্রেনে ব্রডগেজ রেল লাইনে দিল্লী যেতে পারেন। আর আহম্মদাবাদ থেকে মেহসানা হয়ে মিটার গেজ লাইনেও আপনি দিল্লী যেতে পারেন।

রাস্তা ব্রডগেজের হোক অথবা মিটার গেজেরই হোক, অবশেষে দুটি লাইনই দিল্লী গিয়ে এক স্থানে মিলে গেছে। রাজা জনকাদি ঋষিগণ, নরসিংহ মেহতা, স্বামী শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। যে ব্যক্তি যে মার্গের অধিকারী সেই ব্যক্তির জন্য সেই মার্গই অধিক কল্যাণকারী। শ্রী নরসিংহ মেহতা প্রথম দিকে ভক্তি মার্গ অবলম্বন করে অগ্রসর হলেও পরিশেষে তিনি জ্ঞান মার্গে চলেছিলেন। তাঁর ভক্তি জ্ঞানের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। প্রথমে তিনি ভক্তি মার্গে চললেও পরে তার গানের পদের মধ্যে কেবল জ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

"অখিল ব্রহ্মান্ড মে এক তু শ্রী হরি, অনেক রূপ সে অনন্ত ভাসতা হে।
বেদ তো এসা হী কহতে হে, শ্রুতি স্মৃতি ভী সাক্ষী দেতে হে, কনক ওর কুন্ডল মে
ভেদ নহী হে।
আকর দেনে কে বাদ নাম-রূপ অনেক (অলগ) হো জাতে হে।
অন্ত মে তো হেম-সোনে কা হেম-সোনা হী রহ জাতা হে।।"

(অর্থাৎ এই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু তুমি শ্রী হরি, অনেক রূপে অনন্ত ভাসিত হচ্ছে, বেদ শ্রুতি- স্মৃতি তাই বলছে। স্বর্ণ নির্মিত কুন্ডল-অলংকারের মধ্যে স্বর্ণ রয়েছে। বিভিন্ন অলংকারের আকার এবং নাম বিভিন্ন হলেও এক স্বর্ণইতো। এক স্বর্ণকে বিভিন্ন অলংকার রূপে বিভিন্ন আকার দেওয়ার পরে নাম এবং রূপ বিভিন্ন হলেও বস্তুত তা স্বর্ণইতো।)

কর্মমার্গ যেন ব্রডগেজের রাস্তা, বিশাল রাজমার্গ। কেহ যদি রাজমার্গে প্রশস্ত পথে চোখ বন্ধ করে চলেন তাহলেও তাঁর পতিত হবার ভয় কম থাকে। শাস্ত্র এবং সাধু-সন্তগনের নির্দেশ মেনে, ন্যায়-নীতি এবং ধর্ম অনুসরণ করে 'নিয়ত কর্ম' করতে করতে সাধকের জীবনে প্রতিটি কর্মই

ভক্তিময় হয়ে উঠে। শ্রী ‘সেনা নাই’ নাপিতের কাজ করতেন। শ্রী ‘সজ্জন’ কসাইয়ের কাজ করতেন, শ্রী ‘গোরা ভাই’ একজন কুমার রূপে মাটির পাত্র প্রস্তুত করতেন। এমন আরও কর্মমার্গের অনুসরণকারী অনেক সাধকগণ ন্যায়-নীতি-ধর্ম মেনে, শাস্ত্র এবং সন্তগণের নির্দেশ অনুসরণ করে, তাদের নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করেও তাঁরা তাঁদের প্রত্যেকটি কর্মকেই ভক্তিময় করে তুলেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকটি ক্রিয়া ভক্তিতে পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল।

যদি কোন মাতা মন্ত্র পাঠ করে শিব লিঙ্গের উপরে পঞ্চাশ ঘটি জলধারা দিতে অসমর্থ হন, তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যদি ঐ গর্ভধারিণী মাতা তার ছোট্ট শিশু-পুত্রটিকে ভগবদ্ জ্ঞানে সেই ঘটি ভর্তি জল দ্বারা স্নান করিয়ে পরিষ্কার করেন এবং সেই সময় এই ভাবনা রাখেন, “আমি ভগবান শংকরের অভিষেক করছি”, তাহলে ময়লাযুক্ত বালকের স্নান করানোর কর্মটিও ভগবান শংকরের প্রতি একটি ভক্তিময় কর্ম হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ঐ মাতার শিশু পুত্রটি অবহেলিত হয়ে, ময়লাযুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে, আর ঐ মহিলা যদি সারাদিন ধরে শিবলিঙ্গের উপর ঘটি ভর্তি জল ঢালতে থাকেন, তাহলে ভগবান শংকরকে ভক্তির বিশেষ কোন ফল তার প্রাপ্তি হতে পারে না।

বস্তুতঃ কর্মমার্গ এক বিশাল মার্গ, যেন ন্যাশানাল হাই-ওয়ে। আর ভক্তিমার্গ কর্মমাগের চেয়ে আরও কঠিন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ভক্তের লক্ষণগুলি বর্ণনা করেছেন। খাঁটি ভক্ত হবার জন্য এ সকল গুণ গুলি প্রাপ্ত করতে হবে। জ্ঞান মার্গ খুবই ছোট, সংক্ষিপ্ত (short cut) রাস্তা। তা অত্যন্ত কঠিন মার্গ। গোস্বামী তুলসী দাস লিখেছেন,

“জ্ঞান পংথ কৃপাণ কী ধারা।”

অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ যেন ধারাল কোন তলোয়ারের উপর দিয়ে চলার মত

কঠিন মার্গ। জ্ঞানমার্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পথ হলেও তাতে যেন বিচিত্র রকমের গলির মধ্য দিয়ে চলতে হয়। সেই পথে চলার গলির মধ্যে সঠিক রাস্তা অবগত রয়েছেন এমন সঙ্গী-সাথী পেলে রাস্তা চলার পথ সুগম হয়। এই পথে অতি সাবধানের সাথে চলতে হয়। অন্যথায় গলি থেকে বাইরে বের হওয়া কঠিন হয়ে যায়, ঐ স্থানেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। জ্ঞান মার্গে চলার জন্য সম্যক জ্ঞানী এবং সামর্থ্যতাপূর্ণ সদ্‌গুরু আবশ্যক হয়।

(ii) ভক্ত এবং জ্ঞানী : ভক্ত যেন বিড়ালীর বাচ্চা, জ্ঞানী যেন বানরীর বাচ্চা। বিড়ালীর বাচ্চা জন্ম নেবার পরে সাত দিন পর্যন্ত অন্ধ থাকে, ঐ সাত দিন বিড়ালী তার বাচ্চাকে মুখে নিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরা ফেরা করে। বাচ্চা তার মায়ের অনন্য শরণাগতি নিয়ে পড়ে থাকে। বাচ্চার মা ওকে উনুনের মধ্যে রাখুন বা জলে ভর্তি পাত্রের মধ্যে অথবা অন্য যে কোন জায়গায় রাখুন না কেন, তাতে বাচ্চার কোন চিন্তা নেই। কিন্তু বাচ্চার মায়ের সদা অত্যন্ত চিন্তা থাকে, তাই খুব সাবধানতার সাথে বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে চলা ফেরা করে থাকে।

আর বানরীর বাচ্চার বেলায় দেখা যায় যে যখন বাচ্চার মা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে লাফিয়ে যাবার ইচ্ছা করে প্রস্তুত হয় তৎক্ষণাৎই বাচ্চাটি মায়ের বুক জড়িয়ে ধরে এবং বানরী যখন এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে লাফা-লাফি করে তখন বাচ্চা মায়ের বুকে শক্ত ভাবে জড়িয়ে থাকে। তা না হলে বাচ্চা নীচে পড়ে গিয়ে মারা যাবে। বানরী নিজের বাচ্চাকে নিজে ধরে থাকেনা, বাচ্চাই মাকে জড়িয়ে থাকে। এ সত্য যে বিড়ালীর নিকট ওর বাচ্চা যেমন আদুরে সন্তান, বানরীর কাছেও ওর বাচ্চা তেমনই আদুরে। উভয়ের বাৎসল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তথাপি বিড়ালী এবং বানরীর নিজ নিজ বাচ্চার প্রতি ভিন্ন প্রকারের আচরণ লক্ষ্য করা যায়, আচরণে পার্থক্য দেখা যায়।

কোন পিতা কখনও তার ছোট্ট শিশু পুত্রটিকে কোলে নিয়ে ঘুরা ফেরা করে থাকেন। কিন্তু পুত্রের একটু বয়স বৃদ্ধি হলে তখন পিতা বালকের আঙ্গুল ধারণ করে চলা ফেরা করেন। আর পুত্র যৌবন বয়স প্রাপ্ত হলে, পিতার বৃদ্ধাবস্থায় সেই যুবক-পুত্র পিতার অঙ্গুলী ধারণ করে পথ প্রদর্শন করে থাকে।

শ্রী তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন,

"মোরে প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী।"

অর্থাৎ ভগবান যেন বলছেন, "জ্ঞানী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভক্ত আমার কনিষ্ঠ পুত্র।" জ্ঞানী-সাধক ভগবানের ধ্যান করেন, আর ভগবান স্বয়ং ভক্তের ধ্যান করেন (খেয়াল রাখেন)। তথাপি জ্ঞানী এবং ভক্ত উভয়ের উপরই ভগবানের কৃপা সমান।

35. জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম এই তিন মার্গে চলা সাধকের ভগবদ্ সাধনা পৃথক ধরনের হয়ে থাকে : কর্ম মার্গের সাধক বলেন, "আমি ভগবানের।" ভক্তি মার্গের ভক্ত সাধক বলেন, "ভগবান আমার।" আর জ্ঞান মার্গের সাধক বলেন, "আমি এবং ভগবান এক-ই।"

যুবতী স্ত্রী বিবাহের পরে তার শ্বশুরালয়ে গমন করে বলেন, "আমি আমার স্বামীর গৃহিনী, তিনি যেমন বলেন আমি তেমনই চলি। স্বামী যদি বলেন, আজ আলুর তরকারী প্রস্তুত করো, তাহলে আমি তাই করি, ভেন্ডীর তরকারী প্রস্তুত করতে বললে তাই করি, যে রঙের শাড়ী পরিধান করতে বলেন, তাই পরিধান করি। কোন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললে তাই করি, আবার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করলে তাও মেনে চলি। স্বামী যা বলেন আমি তাই পালন করে থাকি।" এই অবস্থায় স্ত্রী বলেন, "আমি স্বামীর।" কিন্তু সেই স্ত্রী তার প্রৌঢ় (বয়স্কা) অবস্থায় যখন দু'তিন সন্তানের মা হলেন তখন তিনি বলেন, "স্বামী আমার।" তখন স্ত্রী যদি বলেন, "ওগো, আজ তোমাকে এই সামগ্রী আনতে

হবে, তাহলে স্বামীকে তাই আনতে হয়। স্ত্রী যদি বলেন, "এই বস্তু গৃহে আনবে না", তাহলে সেই বস্তু গৃহে আনতে পারেন না। যদি বলেন, "এই স্থানে চলুন," তাহলে স্বামীকে সেখানে যেতে হয়। যদি কোন বিশেষ জায়গায় যেতে নিষেধ করেন, তাহলে স্বামী ঐ স্থানে যেতে পারেন না। এই মহিলার যখন বিবাহ হয়েছিল তখন তিনি বলতেন, "আমি স্বামীর"। তারপর বয়স বৃদ্ধি হলে, অবস্থা পরিবর্ত্তন হলে তিনি বলেন, "স্বামী আমার।" আর সেই স্ত্রী বৃদ্ধা হলে তখন স্বামীও বৃদ্ধ হয়ে পড়েন। সেই অবস্থান বৃদ্ধ-বৃদ্ধা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যেন এক হয়ে যান। তখন স্ত্রী বলেন, "আমি এবং আমার স্বামী এক।" স্ত্রী প্রথমে বলতেন, "আমি স্বামীর", পরে বলতেন, "স্বামী আমার।" আর এখন বলছেন, "স্বামী এবং আমি এক"। এই সময় যেন অদ্বৈত অবস্থা এসে যায়।

তদ্রূপ ভাবে, কর্মমার্গের সাধক বলেন, "আমি ভগবানের।" ভগবানের নির্দেশ মত তিনি কর্ম করেন। তাতে তাঁর প্রত্যেকটি কর্মই ভক্তিময় হয়ে থাকে। আর সাধক যখন ভক্তিমার্গের যোগ্য অধিকারী হন তখন তিনি বলেন, "ভগবান আমার"। অর্থাৎ কর্ম মার্গে কর্মযোগী বলেন, "আমি ভগবানের।" ভক্তি মার্গে ভক্ত-সাধক বলেন, "ভগবান আমার।" এই অবস্থায় ভগবানকে ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করতে হয়, ভক্ত যা বলেন ভগবান তা করেন। ভক্ত কখনও বলেন, "আমার রথটি চালনা করুন।" ভগবান স্বয়ং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের রথ চালনা করেছেন, তার ক্লান্ত ঘোড়াকেও স্নান করাতেন, সেবা করতেন। ভক্ত বলেন, "আমার অমুক কাজ করে দিতে হবে"। তখন ভগবানকে সেই কাজ করে দিতে হয়।

কর্মমার্গ এবং ভক্তি মার্গে দ্বৈত-বোধ থাকে। অর্থাৎ "আমি এবং ভগবান" এরূপ পৃথক বোধ থাকে। কর্ম মার্গের সাধক বলেন, "আমি ভগবানের।" ভক্তি মার্গের সাধক বলেন, "ভগবান আমার।" আর জ্ঞান মার্গ অদ্বৈত। জ্ঞান মার্গে ভগবান এবং জ্ঞানের সাধক এক-অভিন্ন হয়ে

যায়। জ্ঞানী বলেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি।" অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মস্বরূপ।" "জীব এবং ভগবান তখন পৃথক না থেকে অদ্বৈত হয়ে যায়।

উপরের বর্ণনানুসারে কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞান মার্গ দ্বারা জীব ক্রম অনুসারে ক্রিয়মাণ, প্রারব্ধ এবং সঞ্চিত কর্মকে সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত করে মোক্ষ লাভ করতে পারে। মোক্ষ-লাভ করা সকল জীবেরই সম-অধিকার রয়েছে। আত্যন্তিক দুঃখের চির-অবসান এবং শাশ্বত সুখ-শান্তি প্রাপ্তিই মোক্ষ—আজ এতটুকু পর্যন্তই বলা হলো।

"সর্বত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।।"

পরিশিষ্ট

শ্রী হীরাভাই ঠক্কর যখন নিজ জীবনের ৬০ বর্ষে প্রবেশ করেছিলেন (সংবৎসর ২০৩৩, আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া তিথি, রথ যাত্রার দিবস) তখন ঐ দিবসে এই পুস্তকটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। তারপরে আহম্মদাবাদ থিয়োসঁফিকেল সোসাইটিতে তা পাঠ করা হলে কিছু সাধক ভক্তবৃন্দ এই পুস্তকের উপর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। আর তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী হীরাভাই ঠক্কর যে প্রবচন করেছিলেন, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে তা সমাবিষ্ট করা হলো, পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ তা পাঠ করার জন্য।

36. (i) ক্রিয়মাণ কর্ম করার ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন : পরমাত্মা ক্রিয়মাণ কর্ম করার বিষয়ে মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন যোনিতে এরূপ পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। কেননা অন্য সব যোনি ভোগ-যোনি, যেখানে কেবল প্রারব্ধ ভোগ করে শরীর ত্যাগ হয়ে থাকে, সেখানে নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম সঞ্চিত রূপে জমা হয়না। এই পুস্তকে পূর্বে 19(iii) নং পয়েন্টে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি উত্তম গুণ সম্পন্ন সজ্জন-ব্যক্তি হওয়ার স্বাধীনতা রাখেন। আবার তিনি কোন দুর্জন ব্যক্তি হিসাবে নিজের জীবনে সংকট ও অনিষ্ট ডেকে আনতে পারেন, এ বিষয়েও তিনি পূর্ণ স্বাধীন। কাউকে কিছু দান করার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে, আবার কারো নিকট থেকে কিছু দান গ্রহণ করারও স্বাধীনতা তার রয়েছে। সত্য বলার স্বাধীনতা রয়েছে, তদ্রূপ মিথ্যা-বচন বলারও স্বাধীনতা তার রয়েছে। ওহে, মনুষ্য যোনিতে আত্মহত্যা করার স্বাধীনতা পর্যন্ত রয়েছে। কিন্তু পশু-পাখী বা অন্য কোন যোনিতে আত্মহত্যা করার কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়না। পরমাত্মা এমনি ভাবে মানুষকে ক্রিয়মাণ কর্ম করার বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। অধিকন্তু পরমাত্মা মনুষ্য যোনিতে অর্থাৎ মানব শরীরে বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় নামক দু'টি কোষ প্রদান করেছেন, যা অন্য কোন যোনিতে নেই। খারাপ হওয়ার স্বাধীনতা না থাকলে ভাল হওয়ার স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যেতো। বিশ্বাস-ঘাতকতার স্বাধীনতা রয়েছে বলেই সৎ বিশ্বাসী হওয়ার মূল্য রয়েছে, মিথ্যাবাদী, বেইমান হওয়ার স্বাধীনতা আছে বলেই সত্যবাদী এবং সৎ হওয়ার মূল্য এবং বিশেষত্ব রয়েছে।

সুতরাং দেখা গেল যে ভাল হওয়া অথবা খারাপ হওয়া, এই উভয় প্রকার স্বাধীনতাই মানুষের রয়েছে। তাই এই স্বাধীনতাকে বলা হয় পূর্ণ স্বাধীনতা। আপনি যদি বলেন, "আমি আমার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি, গৃহের

আলমারীটিও তাকে অর্পন করে দিয়েছি, অথচ গৃহ এবং আলমারীর চাবি তাকে না দিয়ে যদি তা আপনি আপনার কাছে রাখেন, তাহলে একে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যাবে না বরং এ এক প্রকার পরিহাসই হবে।

একবার আমি একটি হাসির গল্প পড়েছিলাম। আমেরিকায় হেনরী ফোর্ড যখন সর্বপ্রথম মোটরগাড়ী প্রস্তুত করেন তখন সব মোটরের গায়ে কালরঙ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ গাড়ী বিক্রয়ের দোকানে বোর্ডে একটি বিজ্ঞপ্তি লিখে দেওয়া হয়েছিল, "গাড়ী ক্রয়ের সময় আপনি যেন কোন রঙের গাড়ী পছন্দ করে নিতে পারেন, তবে শর্ত হলো যে তা কাল রঙের হওয়া আবশ্যক।"

আসলে সব মোটরগাড়ী গুলি কাল রঙেরই ছিল, দ্বিতীয় কোন রঙের ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার অপ-ব্যাখ্যা করে বোর্ডে লিখে দিয়েছিল, "আপনি যে কোন রঙ পছন্দ করতে পারেন, তবে শর্ত হলো গাড়ী হবে কাল রঙের।"

36.(ii) যতটুকু স্বাধীনতা, দায়িত্বও ততটুকু : "Freedom implies responsibility."

স্বাধীনতা দ্বিমুখী হয়না। স্বাধীনতা বৃদ্ধি হলে দায়িত্বও বৃদ্ধি হয়, আর স্বাধীনতা কম হলে দায়িত্বও কমে যায়। আপনি ক্রিয়মাণ কর্ম করার বিষয়ে স্বাধীন অথচ এর দায়িত্ব গ্রহণ থেকে মুক্ত থাকবেন এরূপ দ্বিমুখী বা বিপরীত মুখী বিষয় হতে পারেনা। আপনি কর্ম করার বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও সেই কর্মের ফল বা পরিণাম ভোগ করার জন্য আপনি পরাধীন, তা নিশ্চিত রূপে আপনাকে জানতে হবে। তাই ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ২।৪৭ নং শ্লোকে বলেছেন, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অর্থাৎ "কর্মে তোমার অধিকার, কখনও ফলে নয়।"

আর শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ে ১৪-১৫ নং শ্লোকে সাথে সাথে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে, "তুমি কর্ম করো, তাতে

আমার কোন প্রকার দায়িত্ব বা অংশীদারিত্ব নেই।"

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্মানি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৫।১৪-১৫)

অর্থাৎ "বাস্তবিক পক্ষে পরমেশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফল সংযোগকে রচনা করেন না। কিন্তু বস্তুতঃ জীবের স্বভাব বা প্রকৃতিই তা প্রবর্ত্তন করে থাকে।"

"বিভুঃ অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মা কারো পাপ কর্ম ও শুভকর্ম গ্রহণ করেন না। মায়া দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীব মোহিত হচ্ছে।"

কর্ম করার ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বটে, কিন্তু সেই কর্মের পরিণাম বা ফল যা হবে তাতো আপনাকেই ভোগ করতে হবে। আপনি পাপ কার্য করলে দুঃখ ভোগ করবেন, এর ফল ভগবান কেন ভোগ করবেন? আপনি পুণ্য করলে এর ফল সুখও আপনিই ভোগ করবেন। আপনার কৃত শুভকর্মের পুণ্য-ফল ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই। তবে হাঁ, ভোগ না করা আপনার পুণ্য ফল ভগবানের নিকট জমা থাকে। আপনি কাউকে খুন করলেন, আর এর জন্য আপনার পিতার ফাঁসি হবে, তা ন্যায় হতে পারে না। একবার ভীম খুব ভোজন করেছিলেন, আর এর ফলে মামা শকুনির খুব পাতলা পায়খানা শুরু হয়েছিল। এরূপ বিচার হয়ত কৌরবদের রাজ্যে হয়েছিল, (কিন্তু ইহা ব্যতিক্রম)। ভগবানের রাজ্যে তা হওয়ার নয়।

সকাম কর্ম মাত্রই 'কর্ম-বন্ধন' হয়ে থাকে। বিষয়টি আপনাকে সঠিক রূপে বুঝতে হবে। কর্ম করার পূর্বে কর্ম কিরূপে করতে হবে তা নির্ণয় করার বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভগবানও এরূপ বলেন, "তুমি

সৎগুণ সম্পন্ন সজ্জন হওয়ার বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন। ("You are free, you are independent provided you are good)

কিন্তু আপনি সজ্জন না হলে স্বাধীনতার মূল্য রইলো কোথায়? সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হলো আপনার ইচ্ছা হলে আপনি দুর্জনও হতে পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন, এর পরিণাম বা ফলভোগের দায়িত্বও আপনার, পরমাত্মার নয়।

একবার কর্ম করার পর এর ফলে বন্ধন দশা উপস্থিত হলে তা আপনাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। একবার এক ব্যক্তি এক সাধু মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মহারাজ, কর্ম করার বিষয়ে আমার স্বাধীনতা কতটুকু?"

তখন মহাত্মা তাকে বললেন, "তুমি একটি পা উঁচু করে অপর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যাওতো।" তখন মহাত্মার নির্দেশ মত ঐ ব্যক্তি তাই করলেন। তিনি ডান পা উঁচু করে বাম পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেলে মহাত্মা তাকে বললেন, "এখন ডান পা না নামিয়ে বাম পা টি উঁচু করো।" ঐ ব্যক্তি বললেন, "মহারাজ, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? তা কি করে সম্ভব?"

মহাত্মা বললেন, "তুমি যদি প্রথমে বাম পা উপরে উঠাতে, আর আমি যদি বলতাম বাম পা আরও উপরে উঠাও, তাহলে তুমি তা উঠাতে পারতে।" লোকটি মহাত্মার কথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, "হাঁ, প্রথমে আমি বাম পা উঠানোর বিষয়ে স্বাধীন ছিলাম, কেননা ডান পা উঠানোর বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম না।"

মহাত্মা বললেন, "দেখ, এমনি ভাবে কোন কর্ম করার বিষয়ে তুমি স্বাধীন। কিন্তু সকাম কর্ম করার সাথে সাথেই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়।"

তাই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় এ বিষয়ে ভগবান স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দিলেন,

1. "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে" (কর্মণি + এব + অধিকারঃ + তে) (২।৪৭)

অর্থাৎ "কর্মেই তোমার অধিকার। অর্থাৎ কর্ম করার বিষয়ে তুমি স্বাধীন।" কিন্তু

2. "মা ফলেষু কদাচন।" (২।৪৭)

অর্থাৎ "কর্ম ফলে তোমার অধিকার বা স্বাধীনতা নেই। অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করার বিষয়ে তুমি পরাধীন।"

এবার তৃতীয় নির্দেশটি শ্রবণ করুন।

3. "মা কর্মফলহেতুর্ভুমা (কর্মফল হেতুঃ + ভূঃ + মা) (২।৪৭)

অর্থাৎ "ফল মিলবে, তাহলেই কর্ম করবো, এরূপ ভাবনা রেখো না।" অর্থাৎ কর্ম ফলের দিকে লক্ষ্য না রেখে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা উচিত।

36. (iii) ফলের দিকে লক্ষ্য না রেখে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা উচিত : সাধারণতঃ আমরা যখন কোন কর্ম করে থাকি তখন সেই কর্ম বিশেষ কোন ফলের ইচ্ছা নিয়েই করে থাকি। নিজের ইচ্ছানুসারে কর্মফল লাভ হলে তাকে আমরা সফল কর্ম মনে করি। আর ইচ্ছানুসারে ফল না পেলে তা নিষ্ফল হয়েছে বলে ধরে নিই।

যে কোন কর্মেরই দু'প্রকারের পরিণাম হয়ে থাকে। যথা—সফলতা এবং বিফলতা। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কোন কর্মই নিষ্ফল হয়না। আপনি যে কোন কর্মই করুননা কেন এর কোন না কোন ফল তো পাবেনই। এই অর্থে যাবতীয় কর্মই সফল হয়ে থাকে। কিন্তু আপনার ইচ্ছামত ফল লাভ হবে, এমনতো কোন গ্যারান্টী নেই। আপনার ইচ্ছামত ফল না পেলে আপনি ঐ কর্মকে নিষ্ফল বলে মনে করেন। কিন্তু তা করা ভুল। কেননা কোন কর্মই বিফল বা নিষ্ফল হয়না। কর্মতো ফল দিবেই। আপনাকে স্বীকার করে নিতেই হবে যে ঐ ফল আপনার ধারণা বা ইচ্ছানুসারে হয়নি। এর কারণ হলো ঐ কর্মে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা ছিল। কর্মের ফলতো ঈশ্বরের বিধান অনুসারে লাভ হবে। কর্মফল প্রাপ্তির বিষয়ে অন্য কারো কোনরূপ সুপারিশ বা ইচ্ছা চলেনা।

যদি কোন কর্ম শুরু করার সময়ে, কর্ম করার সময়ে এবং কর্মটি পূর্ণ করার সময় অর্থাৎ তা শেষ হলে আপনি শুধু ফলের উপর দৃষ্টি বা লক্ষ্য রেখে কর্ম করেন, তাহলে ঐ কর্মটি যতটুকু উত্তম হওয়ার কথা ছিল তা হতে পারেনা, অর্থাৎ সেই কর্মের আশানুরূপ ফল আপনি পেতে পারেন না।

তাই ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় নির্দেশ দিয়েছেন, "মা কর্মফলহেতুঃ ভূঃ।" অর্থাৎ "কর্ম ফলে তোমার অধিকার (বা হাত) নেই। কেবল ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম করলে তাতে লাভ নেই বরং ক্ষতিই হবে। এই বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে হবে।

আপনার ইচ্ছামত ফল না পেলে বা ফল কম পেলে মনে নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

1. আপনার মনে অত্যন্ত গ্লানি সৃষ্টি হবে।
2. আপনার মনে চঞ্চলতা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হবে।
3. ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার উপর আপনার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে।
4. 'আমি সঠিক কর্ম করতে অসমর্থ'; নিজের সম্পর্কে এরূপ হীন ভাবনা মনে জাগ্রত হবে।
5. 'ঈশ্বরের নিকট আমি অসহায়', এরূপ ভাবনা সৃষ্টি হবে।
6. এখন কর্ম করার কোন অর্থ নেই, মনে এরূপ নিরাশা-হতাশা উৎপন্ন হবে।
7. আর তাতে কর্ম পরিত্যাগ করার এক প্রকার মানসিক বৃত্তি জাগ্রত হবে।

আর যদি কর্মের ফল আশাতীত, কল্পনাতীত ভাবে, অনেক বেশী গুণ লাভ হয়, তাতে হানি কারক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন—

1. নিজের কর্ত্তৃত্ব শক্তির জন্য অহংকার সৃষ্টি হবে।
2. প্রাপ্ত ফলের জন্য অভিমান হবে।

3. "আমি ইচ্ছামত কর্ম করতে পারি", এরূপ গর্ব হবে।

4. ভবিষ্যতে অন্যান্য কর্ম করার দক্ষতা ক্ষীণ হতে পারে।

এমনিভাবে উপরে বর্ণিত দু'ভাবেই আপনার ক্ষতি হবে। কর্মতো তার নিজ ফল প্রদান করবেই। কিন্তু কর্ম ফল ভোগ করার সময় মনের 'সমত্ব ভাব' হারিয়ে ফেলা সাধকের জন্য বড় ক্ষতি। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ভগবান 'সমত্ব সম্বন্ধে খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "সমত্বং যোগ উচ্যতে।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৪৮) (অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, লাভ-হানি, জয়-পরাজয়, সিদ্ধি-অসিদ্ধি অর্থাৎ কর্মে সফলতা বিফলতা ইত্যাদিতে দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হয়ে মনের সমত্ব ভাবের স্থিতি রক্ষা করাকে যোগ বলা হয়।) এমনিভাবে কর্ম করলে, কর্ম করেও কর্মে আসক্ত হতে হয়না, কর্ম করেও পাপ হবে না, "নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।" শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৩৮) সমত্বই যোগ। চিত্তের প্রসন্নতা হারানোই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

"মা ফলেষু কদাচন", এবং "মা কর্মফল হেতুঃ ভূঃ", ভগবানের এই দু'টি নির্দেশের অর্থ আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে, সুস্পষ্ট ভাবে অবশ্যই বোঝার আবশ্যকতা রয়েছে। "মা ফলেষু কদাচন" এর অর্থ কি? কর্ম করার পূর্বে ফলের দিকে খেয়াল ও দৃষ্টি না রেখে যেন চক্ষু এবং বিচার বুদ্ধি বন্ধ করে (অর্থাৎ বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে) কর্ম করে চলা? এর সুস্পষ্ট জবাব হলো—না, তা নয়। এরূপ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। ভগবানের বাণী অতিশয় গভীর এবং গূঢ় অর্থপূর্ণ। এর ভাসা ভাসা, হাল্কা অর্থ হতে পারেনা। যাতে এর অর্থ ব্যবহারের উপযোগী হয়, সেজন্য, অতি সাবধানতার সাথে এর অর্থ জানতে হবে। কর্ম পদ্ধতি শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত হতে হবে। কর্ম শুরু করার পূর্বেই এ বিষয়ে খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে যে এর কর্ম ফল কি হবে?

উদাহরণ স্বরূপ একজন কৃষক গ্রীষ্ম ঋতুতে যেখানে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই, এমন এক অনুর্বর, রুক্ষ, ক্ষারযুক্ত ভূমিতে অন্ন উৎপাদন

করার উদ্দেশ্যে বীজ বপন করলেন। আর শীঘ্রই ঐ বীজ উষ্ণ তাপে নষ্ট হয়ে গেল, তা হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ ভাবে কর্ম করা ভুল। "কর্মের ফল বিচার করোনা?" এর যথার্থ অর্থ হলো "কর্মফলের প্রতি আসক্তি এবং লোভ পরিত্যাগ করো।" কিন্তু যে কোন কর্মই হোক না কেন, ঐ কর্মে যাতে উত্তম ফল লাভ হয়, সেই ভাবনা রেখে কর্মটি উত্তম রূপে করার জন্য যথাশক্তি পুরুষার্থ প্রয়োগ করা অবশ্যই আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় কর্মফল ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় "ফলকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া, অথবা কর্মের ফল যেন আমার না মিলে, অথবা 'কর্ম ফল আমি গ্রহণ করবো না।" কর্ম, তার ফল না দিয়ে ছাড়বেই না, অর্থাৎ প্রতিটি কর্মেরই ফল আছে।

"আমার দ্বারা করা কর্মের ফল আমি ভোগ করতে চাইনা" এরূপ কথা কে বলে থাকে? চোর, ব্যভিচারী, দুষ্ট প্রভৃতি লোক যারা অসৎ ও পাপ কর্ম করে থাকে তারাই তা বলে থাকে। অথচ পাপ কর্মের ফল, দন্ডস্বরূপ দুঃখ ভোগ করতে তারা চায়না। কিন্তু তাতো হতে পারে না। পাপ কর্মের ফল দুঃখ 'কর্ম-কর্ত্তাকেই' ভোগ করতে হবে।

সুতরাং 'ফল লাভ হবে, তবেই কর্ম করবো', এরূপ ভুল মানসিকতা নিয়ে ভ্রমে পতিত হওয়া আমাদের উচিত নয়।

36. (iv) "আমি কর্ম করবো না, ফলও ভোগ করতে হবে না", তা হতে পারে কী? : এইরূপ বলা এবং করাকে শুধু এক প্রকার ছল-কপটতা বা দুষ্টুমী বলা যেতে পারে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ২।৪৭ শ্লোকের শেষাংশে বলেছেন,

"মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি (সঙ্গঃ + অস্তু + অকর্মণি)।।

অর্থাৎ "কর্ম না করাতে তোমার প্রীতি, ইচ্ছা বা আগ্রহ না হোক।" (গীতা ২।৪৭)। কর্ম জড়-মূলের সঙ্গে ত্যাগ হতেই পারে না। ছোট একটি বাচ্চা যদি বলে, "আমি স্কুলে যাব না, পড়াশুনা করবো না, আহারও

করবোনা।” তাহলে তার মাতা-পিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন। কেহ যদি বলে, “আমি চাকুরী করবোনা, বেতনও চাইনা। আমি ব্যবসা করবোনা, লাভও চাইনা।” এরূপ বলা ব্যর্থ এবং নিরর্থক বচন মাত্র। যদি কোন কাঠ-মিস্ত্রী বলে, “আমি মিস্ত্রীর কাজ করবোনা, বেতন বা পারিশ্রমিক চাইনা,” তদ্রূপ ভাবে যদি রাজ-মিস্ত্রী, ঝাড়ুদার, দিন-মজুর, দর্জী প্রভৃতি লোক এরূপ বলে, “কর্মও করবোনা, পারিশ্রমিক বা বেতনও চাইনা’ তাহলে সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হবে, চারিদিকে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষের মধ্যে প্রমাদ, আলস্য, তমোগুণ বৃদ্ধি পাবে।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন,

“নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদর্মণঃ।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৮)

অর্থাৎ “তোমাকে তোমার নিয়ত কর্ম (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম) করতেই হবে। কেননা কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম না করলে তোমার শরীর যাত্রা (শরীর নির্ব্বাহ) বাধা গ্রস্ত (কঠিন) হয়ে পড়বে।” সুতরাং কর্ম জড় বা মূলের সঙ্গে ত্যাগ করা, ব্যক্তি বিশেষ এবং সমগ্র সমাজের জন্য এক বিপদজনক বিষয় হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ২২ এবং ২৩ নং শ্লোকে বলেছেন,

“ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি।।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।২২-২৩)

অর্থাৎ "হে অর্জুন, তিন লোকে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নেই, কিছুই অপ্রাপ্ত নেই, কিছুই প্রাপ্ত করার নেই (আপ্তকাম)। তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত (নিয়োজিত) রয়েছি। কারণ আমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত না হই তাহলে মানুষ সর্বপ্রকারে আমাকে অনুসরণ করবে।"

মানুষ যাতে নিত্যকর্ম থেকে বিমুখ না হয় সেজন্য ভগবান উপরোক্ত বিষয় গীতায় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। মহাভারতের যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে হয়েছিল। সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বসে আরাম আয়াসের মধ্যে সুখ ও আনন্দের সাথে সময় কাটালে তাঁর কী ক্ষতি হতো? পাণ্ডবদের বিজয় হলে শ্রীকৃষ্ণের কোন গ্রামের জায়গীর বা অপর কোন পুরস্কার প্রাপ্তির কথা ছিল না। যদি কৌরবদের বিজয় হতো তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার রাজসিংহাসনের উপর কোনরূপ সংকট আসতোনা। তথাপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন ঐ সব উপদ্রবের মধ্যে জড়িত হলেন এবং দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত যাত্রা করার কষ্ট স্বীকার করেছিলেন? তিনি দ্বারকায় বসে আরাম আয়াসে সময় কাটাননি। যখন সেই ধর্মযুদ্ধরূপ লীলা শুরু হলো তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর এবং কর্মযোগী হয়ে শুধুমাত্র তা দর্শন করেননি। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের অশ্বের লাগাম এক হাতে ধারণ করে অপর হাতে চাবুক ধারণ করে রথ চালনা করতে বসেছিলেন, অর্জুনের সেবা করেছিলেন।

"সেবা কী সেবা কী দেবাধিদেবনে উমঙ্গ সে সেবা কী। তীর অশ্ব কে
অঙ্গ সে নিকালে, পানী লা কে খুব নহলাকে, খরাবে সে
ঘাব মিটা দিয়ে। বালটী ভর কে পিলায়া মিষ্ট পানী।
সেবা কী সেবা কী ...।।"

অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সারাদিন লড়াই করে ক্লান্ত অর্জুন রাত্রিতে আরাম

করতেন, সুখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতেন, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারা রাত্রি ধরে চাকরের মত কাজ করতেন। অশ্বদের শরীরে লেগে থাকা তীরগুলিকে সতর্কতার সাথে বের করতেন, গরম জল দ্বারা অশ্বদের ক্ষত স্থানগুলি ধৌত করে, শুকিয়ে নিয়ে তাদরকে স্নান করাতেন। তারপর অশ্বদের শীতল জল পান করিয়ে ওদের ক্লান্তি দূর করে দিতেন। তারপর এই জগতের মালিক ভগবান নিজের পীতাম্বরের মধ্যে আহার একত্র করে অশ্বদের ভোজন করাতেন।

এই যোগেশ্বর এবং মহান কর্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ সমাজ এবং জগতকে নির্দেশ দিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৪৮)

অর্থাৎ "হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে কর্ম করো। কর্ম ফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করো। আর সেই কর্ম ফল তোমার ধারণা অনুযায়ী সফল বা বিফল যাই হোক না কেন তাতে সমান বুদ্ধিযুক্ত হয়ে (মনের স্থিরতা রেখে), নিষ্কাম ভাবে কর্ম করো। সফলতা-বিফলতা তে সমত্বভাব বজায় রাখাকে যোগ বলা হয়।

"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৪৮)

এখানে 'যোগ' মানে সমত্ব যোগ। এরূপ অলৌকিক ব্যাখ্যা পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজ এবং জগতকে দিয়েছেন। তা আমাদের সঠিক ভাবে বুঝতে হবে।

36. (υ) যোগ কাকে বলে? : কোন অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি যোগ কাকে বলে, বুঝতে না পারেন, তাহলে তা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু কখনও কোন শিক্ষিত ব্যক্তিও যোগ শব্দটি শ্রবণ করে বিচলিত হয়ে থাকেন। 'যোগ' শব্দটির অর্থ অনেক বিদ্বান এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ

নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে পৃথক পৃথক অর্থ এবং ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু যোগ যদি নিজ জীবনে সঠিক রূপে প্রয়োগ করা না হয়, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি কর্মে যদি যোগের উপযোগ করা না হয়, তাহলে যোগের এমন অর্থ সর্ব সাধারণের জন্য তেমন কোন মূল্য নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাকে যোগ-শাস্ত্র বলা হয়। সঠিক ভাবে জীবন যাপন করার জন্য সম্পূর্ণ নক্সা এর মধ্যে রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই যোগ সাধনায় ব্যবহার করতে পারেন, তাহলেই যোগের যথার্থ মূল্য স্বীকার করা হবে। যদি পণ্ডিত এবং বিদ্বান ব্যক্তি যোগের অর্থ শুধুমাত্র নিজের ভাষণে করে চলেন (অর্থাৎ তা শুধুমাত্র তাদের ভাষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সাধু সন্ন্যাসী বনে গমন করে, একা অবস্থান করে সাধনা করাকেই যোগ মনে করা হয়) তাহলে এমন যোগ সাধারণ মানুষদের জন্য নিরর্থক হয়ে যাবে। বস্তুতঃ কোন মিল ফ্যাকটরীর মজুর- মালিক, কোন লজ চালক (বাসা বা ভবন-মালিক) বা মোটর-আরোহী, একজন শেঠ বা হিসাব রক্ষক, কর্মচারী, অফিসের কোন চাপরাশী বা একজন কালেক্টর অথবা কোন তেল-বিক্রেতা, ঝাড়ুদার, কুলী, কুম্ভকার, দর্জী, ব্যবসায়ী বা চাকর, সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যথা—আহার, শয়ন, উঠা-বসা, স্নান, চাকুরী-ব্যবসা ইত্যাদি সকল প্রকারের কাজ করার সময়, চব্বিশ ঘণ্টাই সতত, ব্যাবহারিক যোগের অর্থ ভাল ভাবে বুঝে কাজ করতে হবে।

নিজেকে বড়ই বিদ্বান বলে মনে করেন, এমন অনেক ব্যক্তি এবং অধিক ধন-সম্পদের মালিক অনেক লোক "যোগ" শব্দটি শ্রবণ করেই বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা বলেন, "না ভাই, আমি যোগ সাধনা করতে পারবো না। কেননা যোগ সাধনা করার সময়-সুযোগ আমাদের নেই, সেই অবসর নেই। সারাদিন ধরে চাকুরী, ব্যবসার মধ্যে থেকে মস্তক উঠানোর অবসর পাইনা, আমরা যোগ সাধনা কখন করবো? যদি

স্ত্রী-সন্তান রোগ-গ্রস্ত হয় তাহলে প্রাতঃকালে শয়ন থেকে উঠেই তাদের হাসপাতালে নিয়ে-যাওয়া, নিয়ে-আসা, রেশনের দোকানে লাইনে দাঁড়ানো, তারপর চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি কাজ থেকে বিকালে ক্লান্ত হয়ে গৃহে ফিরে এসে আত্মীয়-স্বজনদের অনেক প্রকারের ব্যবহারিক ঝামেলার মধ্য থেকে বের হয়ে আসতে পারি না, তাহলে বলুন, যোগ সাধনা করার সুযোগ আমাদের কোথায়?" আমার দৃঢ় ধারণা যে যোগের সঠিক এবং ব্যবহারিক অর্থ এই সকল ব্যক্তিগণ বুঝতে পারেননি। তাঁরা হয়ত বারবার বিভিন্ন প্রবচনে গিয়ে কোন পেশাদার পণ্ডিত-কথাকার ব্যক্তির নিকট দেখেছেন বা শুনেছেন যে 'যোগ' মানে নাক টিপে চার ঘণ্টা বসে থাকা অথবা কোন বৃক্ষের শাখায় পা বেঁধে মস্তকটি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া অথবা ভূমির উপর মস্তক রেখে বসে থাকা অথবা ধুনী প্রজ্বলিত করে ললাটে বিভূতি লাগিয়ে বসে থাকা, ইত্যাদিই হলো যোগ। হয়ত পেশাদারী ব্যক্তিদের প্রবচনে এরূপ ভুল ব্যাখ্যা শুনে ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেন, "যোগ-সাধনা করার অবকাশ আমাদের নেই।"যোগের এরূপ বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে অনেক ব্যক্তিই তাদের মূর্খতার জন্য ভ্রমে পতিত হয়ে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় যোগের এমন সহজ সরল অর্থ বুঝিয়েছেন যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই অনুকূল, সহজে পালনযোগ্য। এবার তা বর্ণনা করা যেতে পারে।

36. (vi) "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৫০)

অর্থাৎ "কর্মে কৌশলতা (চতুরতা) যোগ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা 'যোগশাস্ত্র'। তাই এতে যোগের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন কিনা কোন আইনের গ্রন্থে কোন খুঁটিনাটি শব্দ (technical words) উল্লেখ রয়েছে, সেখানে গ্রন্থের আরম্ভেই মুখ্য ধারাগুলির সম্বন্ধে প্রাথমিক ব্যাখ্যা করে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে "ভূমি-রাজস্ব-আইন" (Land

Revenue Code) পুস্তকের আরম্ভেই ধারাগুলির সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, 'ভূমি' (land) কাকে বলে? 'প্রজাসত্ত্ব বা ভাড়াটিয়ার অধিকার আইন' (Tenancy Act) পুস্তকের প্রথম দিকেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে 'প্রজা কাকে বলে? জমির অধিকারী হওয়ার অর্থ কী? এসব ধারাগুলির বর্ণনা গ্রন্থের শুরুতেই দেওয়া হয়ে থাকে। তদ্রূপ ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা যোগ-শাস্ত্র গ্রন্থের প্রথম দিকেই স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, 'যোগ' কাকে বলে?

ব্যবহারিক জীবনে যোগ কিভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা যায়, এর ব্যাখ্যা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ২।৫০)*

নিজ-কর্ম কুশলতা পূর্বক করাকেই 'যোগ' বলে। নিজ প্রারব্ধ অনুসারে প্রতি ব্যক্তির জীবনে 'যে সকল' কর্ম করা যেরূপ ভাবে স্থির হয়ে রয়েছে, সেই কর্মগুলি সঠিকরূপে, পূর্ণ নিপুণতার সাথে করাকেই যোগ বলে গণ্য করা হবে।

একজন দর্জি একটি শার্ট ঠিকমত, সুন্দরভাবে সেলাই করলো। শার্টটির উভয় হাত ঠিক মত সেলাই করা হলো। পূর্ণ নিপুণতার সাথে, একাগ্র চিত্তে, পূর্ণ মনযোগের সাথে সে এই কাজটি করলো। তাহলে এখানে এই ব্যক্তি "যোগ-সাধনা" করলো বলেই গণ্য করা হবে।

এক মুচী তার গ্রাহকের জন্য ভাল ভাবে সুন্দর জুতা প্রস্তুত করলো, গ্রাহক তা পরিধান করে খুবই প্রসন্ন হলেন। যদি মুচী দক্ষতা এবং কুশলতার (নিপুণতার) সাথে তার চিত্ত বৃত্তিকে স্থির করে জুতা প্রস্তুত করে তাহলে সেই ব্যক্তি 'যোগ-সাধনা' করেছে বলে স্বীকার করা হবে।

*নোট : এই শ্লোকে 'যোগ' শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ব্যাখ্যাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। কারো মতে, এখানে যোগ শব্দ দ্বারা "সমত্বযোগ" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, জয়-পরাজয়, ইত্যাদিতে সমত্বভাব রাখাই 'যোগ'। আর শ্রী হীরাভাই ঠক্কর 'কর্মের কৌশল'কে এখানে 'যোগ' বলে গ্রহণ করেছেন।

আপনি ভগবদ্ স্মরণ করে হেঁটে চলছেন, এমন দক্ষতার সাথে চলছেন যে কোন স্থানে ধাক্কা বা হোঁচট না লাগে, তাহলে আপনি যোগ সাধনা করেছেন বলে গণ্য হবে।

ধরুন, আপনি মানসিক জপ করে জল পান করছেন, এমন ধৈর্য্যের সাথে এবং স্থির বৃত্তির সঙ্গে তা করছেন যাতে কোন হাঁচি না আসে, তাহলে আপনি যোগ করেছেন বলে ধরা হবে।

আপনি ভগবদ্ কথা স্মরণ করতে গেলেন অথবা কোন ধার্মিক পুস্তক পাঠ করছেন, সেই সময় এদিকে ওদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভগবদ্ স্মরণ-সহ স্থির চিত্তে কথা শ্রবণ করছেন বা পুস্তক পাঠ করছেন, তাহলে তা যোগ সাধনা করেছেন বলে গণ্য হবে।

এমনিভাবে জীবনের প্রত্যেকটি কর্মই আপনি যদি দক্ষতা, নিপুণতা, কুশলতা পূর্বক, চিত্ত বৃত্তি স্থির করে তদ্জ্ঞানে করেন, তাহলে আপনি সততঃ যোগ সাধনা করছেন, এরূপ স্বীকার করা হবে।

এক বিদ্যার্থী যদি অধ্যয়নের সময় চিত্ত স্থির রেখে অধ্যয়ন করে এবং খেলা ধূলার সময় চিত্ত একাগ্র করে খেলা ধূলা করে তাহলে তার সে সকল কাজ যোগ বলে গণ্য হবে।

"Work while you work and play while you play.
That is the way to be happy and gay."

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁকে যোগশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা (final authority) বলে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর 'যোগ সূত্র' গ্রন্থে প্রথমেই 'যোগ' এর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

"যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" (সমাধি পাদ, ২নং সূত্র)।

অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা একাগ্রতার নাম যোগ। আর চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলেই "কর্মসু কৌশলম্" স্বাভাবিক ভাবে হয়ে যাবে। আপনি যদি এমন যোগ সাধনা আজ থেকেই, এখন থেকেই শুরু করেন তাহলে তা একটি কাজের কাজ হবে। আর আপনি যদি মনে করেন, "যখন আমি

চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করবো, বৃদ্ধ হবো, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে খাটে শয়ন করে করে শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে সেই সময় যোগ সাধনা শুরু করবো, তা হলে আপনি বস্তুতঃ তা করতে পারবেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বর্ণিত যোগ যদি অতি সাধারণ ব্যক্তির জীবনে তার প্রতিদিনের দিন চর্যার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্তেই উপযোগী না হয়, তাহলে গীতার সাতশ শ্লোক শুধু মাত্র কণ্ঠস্থ করা, তা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র, এর সঠিক মূল্য নেই।

প্রত্যেক ব্যক্তি যদি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার উপযোগী যোগের সহজ, সরল, সুলভ এমন ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে নিজ জীবনের প্রত্যেকটি কর্মই সেরূপ ভাবে করেন তা হলে তার তখন সকল কর্মই ভক্তিময় হয়ে উঠে। তখন ভগবানের সাথে যুক্ত বা যোগ হতে আর কোন বিলম্ব হয় না।

36. (vii) কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান যোগের মধ্যে সমন্বয় : উপরোক্ত দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা এক যোগশাস্ত্র। এতে তিন প্রকার যোগের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—(1) কর্মযোগ (2) ভক্তিযোগ এবং (3) জ্ঞানযোগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ১৮টি অধ্যায় রয়েছে। এর প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মযোগের বিষয়ে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ৭ম-১২ অধ্যায়ে ভক্তি যোগের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ বলা হয়েছে। আর ১৩-১৮ অধ্যায়ে জ্ঞান যোগের বিষয় বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর লক্ষণ এবং চর্তুদশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে সম্পূর্ণ গীতায় কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের সুন্দর সমন্বয় করা হয়েছে।

জীবনে কেবলমাত্র জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ বা শুধুমাত্র কর্ম-যোগ পূর্ণাঙ্গীন রূপে কাজে আসেনা। এই তিন প্রকার যোগ সমন্বয় হলে তবেই জীবন সম্পূর্ণরূপে সুন্দর হয়ে থাকে। তবেই তখন মানুষের প্রত্যেকটি

কর্ম যোগ হিসাবে গণ্য ও প্রকাশিত হয়।

শুধুমাত্র জ্ঞানযোগ মানুষকে শুষ্ক বেদান্তী করে তোলে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' অনুভব ব্যতীত শুধু মুখে যেখানে সেখানে বলে বেড়ালে তাতে তার কোন প্রাপ্তি হবে না, তখন হয়ত তাকে পাগলের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

কর্ম এবং জ্ঞান ব্যতীত শুধুমাত্র ভক্তিযোগ মানুষকে কখনও ভীরু হিসাবে পরিণত করে তোলে। তখন সে ব্যক্তি নিজ জীবনের দায়িত্ব পালন করা থেকে ছুটি নেবার আকাঙ্খায় নিজে ভ্রমে পতিত হয় এবং কখনও অন্য ব্যক্তিকেও ভ্রমে পতিত করায়।

আবার জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত শুধুমাত্র কর্মযোগী অনেক ক্ষেত্রেই কর্মের দায়িত্ব পালন এবং পাপের বোঝা উঠাতেই ব্যস্ত থাকেন।

আর প্রত্যেক কর্মে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের বিবেকপূর্বক সমন্বয় হলে তবেই কর্মে বিশেষত্ব আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন স্ত্রীলোক নিজ-গৃহে ডাল প্রস্তুত করলেন। এখানে প্রস্তুত করার কাজটি কর্মযোগ। "এই ডাল ভগবদ্ স্বরূপ আমার স্বামী, পুত্র, অতিথিগণ ভোজন করবেন" এরূপ প্রেম-পূর্ণ ভাবনা নিয়ে, ভক্তিভাব নিয়ে ডালকে ভালভাবে দু'তিন বার জলে ধৌত করে,বাসন পত্র পরিস্কার করে ডাল তৈরি করা, পানীয় জল স্বচ্ছ কাপড়ে ছেঁকে, নিপুনতার সাথে তা উপযোগ করা ইত্যাদি হলো ভক্তিযোগ। ডালে পরিমাণ মত লবণ, মরিচ, তেঁতুল-গুড়, মসল্লা ইত্যাদি প্রয়োগ করা, পরিমিত উত্তাপে সিদ্ধ করা ইত্যাদি এর জ্ঞানযোগ। এমনিভাবে ডাল প্রস্তুত করার সময় কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞান যোগ সঠিকভাবে সমন্বয় হলেই ডাল প্রস্তুত ক্রিয়ায় পূর্ণ সফলতা আসবে, অন্যথায় নয়। হোটেলে সুস্বাদু ডাল প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাতে কেবল কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ প্রয়োগ করা হয়। প্রেম-ভাবে, সেবা করার উদ্দেশ্যে তা করা হয়না। হোটেলের ডালে হয়ত কোন

মাছি পড়ে গিয়ে তা সিদ্ধ হয়ে গেল, এমনও দেখা যায়।

এখানে ডাল প্রস্তুত করার কাজটি কর্মযোগ, "নারায়ণ রূপে আমার স্বামী, পুত্র, অতিথিকে প্রেমের সঙ্গে স্বচ্ছতা পালন করে ভোজন করাবো" এরূপ ভাবনা ভক্তিযোগ। ডালে কি পরিমাণ মরিচ, লবণ, মসল্লা প্রয়োগ করা হবে সেই জ্ঞানকে জ্ঞানযোগ বলা যেতে পারে। সঠিক উত্তাপ দ্বারা ডাল সিদ্ধ করতে হবে, অন্যথায় মসল্লা উপরে উঠে আসবে, মধ্যস্থলে ডালের জল পড়ে থাকবে, অর্দ্ধসিদ্ধ বা কাচা-পাকা ডালের গাঢ় অংশ নীচে পড়ে থাকবে। সুতরাং দেখা যাবে যে সুস্বাদু ডাল পূর্ণ কৌশল ও নিপুণতার সাথে প্রস্তুত করে ভগবদ্ ভাবনায় পরিবেশন করার মধ্যে কর্মযাগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের সমন্বয় হলে তাতে পূর্ণ সফলতা লাভ সম্ভব, অন্যথায় তা হওয়ার নয়।

ধরুন, একজন বিদ্যার্থীকে গাধার উপর একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হলো। এখানে নিবন্ধ লেখার কাজটি কর্মযোগ। লেখার সময় কাগজের কিনারায় মার্জিন রাখা, সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, কাগজে কোন স্থানে কালি বা অন্য কিছুর দাগ না লাগানো ইত্যাদি কাজকে ভক্তিযোগ বলা যেতে পারে। গাধার দুটি কান, চার পা, একটি পুচ্ছ রয়েছে ইত্যাদি সঠিক জ্ঞানকে জ্ঞান-যোগ বলা যেতে পারে। এমনি ভাবে কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান এই তিন যোগের সমন্বয় হলে সেই রচনা লিখে ঐ বিদ্যার্থী ১০ নম্বরের মধ্যে হয়ত ৯ নম্বর পাবে। কিন্তু ঐ বিদ্যার্থী কর্মযোগ পালন করে রচনা লিখলো বটে, তবে ভক্তিযোগ পালন করলো না, সে মার্জিন না রেখে, কাগজের উপরে দাগ লাগিয়ে লিখলো। আর গাধার উপর কোন জ্ঞান না থাকায় লিখে দিল গাধার তিনটি পুচ্ছ, চার কান, পাঁচ পা থাকে, তাহলে জ্ঞান যোগের অভাবে সে উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

এমনি ভাবে বুঝতে হবে যে আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যেই এই তিনটি যোগ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সরকার আজকাল উন্নয়নের

কাজে (Development activities-এ) কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ হচ্ছে না। কেন এমন হচ্ছে? এর জবাব হলো সেই কাজে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের সঠিক সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

অপর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরুন কোন এক গ্রামে একটি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য একটি বিল্ডীং তৈরির কনট্রাক্ট দেওয়া হলো। কন্ট্রাকটার বিল্ডীং তৈরি করেছে বটে, কিন্তু সেই কাজে হয়ত তার প্রেম-ভক্তি ভাব ছিল না অর্থাৎ সেই স্কুলে বিদ্যার্থীরা পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে একদিন ওরা নেহরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল বা গান্ধীর মত মহান কোন ব্যক্তি সৃষ্টি হতে পারে এরূপ সৎ ভাবনা হয়ত তার ছিলনা, অথবা বিল্ডীং নির্মাণের জন্য কি পরিমাণ সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি সংমিশ্রণ করতে হবে এ বিষয়ে কন্ট্রাকটারের সঠিক জ্ঞান (Technical Knowledge) ছিলনা। তাই প্রথম পঞ্চম বর্ষীয় যোজনায় বিল্ডীং নির্মাণ করা হলো আর তৃতীয় পঞ্চম বর্ষীয় যোজনার সময় সেই বিল্ডীং ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেল।

ধরুন, আমার পরিধানের কাপড় অপরিস্কার হওয়ায় তা স্বচ্ছ করার জন্য তাতে সাবান জল প্রয়োগ করলাম। কিন্তু তা ভালভাবে ধৌত করা না হলে সাবান জল তাতে শুকিয়ে যাবার ফলে কাপড় ফেটে টুক্‌রা টুকরা হয়ে যাবে। তদ্রূপ ভাবে শুধুমাত্র শুষ্ক বেদান্ত জ্ঞান কোন ব্যক্তির অন্তঃপট (অর্থাৎ অন্তকরণ) কে টুক্‌রা টুক্‌রা করে দিতে পারে। হয়ত তাকে একজন শুধুমাত্র শুষ্ক বেদান্তী করে দিবে। তাই কাপড় পরিষ্কার করার জন্য যেমন আমাকে তাতে তরল পদার্থ জল ব্যবহার করতে হয়, জলে কাপড় ভিজাতে হয়, তারপর সাবান জল (অর্থাৎ জ্ঞানযোগ) ব্যবহার করতে হয়। পরিশেষে কাপড়ের উপর কর্মযোগের চোট প্রয়োগ করলে তবেই অন্তঃপট (কাপড়/অন্তঃকরণ) শুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ভগবানের বাণীতে এমন অনেক গূঢ় রহস্য রয়েছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ না করে উত্তম-আধ্যাত্মিক জীবন ধারণের কলা, তা থেকে শিখতে হবে। শুধুমাত্র মৃত্যুর রাস্তায় বসা (অপেক্ষাকারী) বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং সাধু সন্ন্যাসীর জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার রচনা হয়নি। কোন ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে শুভ, শাস্ত্রবিহিত কর্ম করলে তাঁর জীবনে ভক্তি এবং জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। তখন হৃদয়ে ভক্তি ওতপ্রোত হয়ে থাকে এবং চিত্তশুদ্ধির ফল জ্ঞান সেই সাধকের অনায়াসে লাভ হয়ে থাকে। মহাভারতে বৈশ্য আত্মজ্ঞানী তুলাধারের প্রসিদ্ধ কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। 'নীজলী' নামে এক ব্রাহ্মণ আত্ম-জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আগমন করলে তুলাধার বললেন, "ভাই, আমার নিকট একটি মাত্র জ্ঞান রয়েছে যা আমি তুলাধারের (দু'পাল্লাযুক্ত মাপ যন্ত্রের) দন্ড-কাঠি থেকে শিখেছি। আমার তুলাদন্ডটি যেমন কোনরূপ পক্ষপাত রহিত হয়ে স্থির এবং সোজা থাকে তদ্রূপ ভাবে আমিও সর্বদা শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকল ব্যক্তির প্রতি আমার মনকে স্থির এবং পক্ষপাত শূন্য রাখি।" 'নাপিত-সেনা', 'কুম্ভকার-গোরা', 'মালী-সাংবতা', জাতিতে মুসলমান 'জুল্‌হা কবীর' প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নিজ নিজ জীবিকা এবং কর্মমার্গে নিয়োজিত থেকেও সঠিকভাবে জীবন যাপন করে ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞানমার্গে অবস্থান করেছিলেন, এবং তাঁরা মোক্ষও লাভ করেছিলেন। 'নাপিত-সেনা' মানুষের মস্তকের চুল কেটে মস্তকের ময়লা দূর করে নিজ মস্তিস্কের ময়লা 'বিষয়-বিকার' দূর করে দিয়েছিলেন। 'কুম্ভকার গোরা' মাটির পাত্র পাকাতে পাকাতে (তাপিত করতে করতে) নিজের জীবনরূপী মটকাটি (পাত্রটি)ও পরিপক্ক করে নিয়েছিলেন। 'মালী-সাবতা' নিজের বাগানের আগাছা, ঘাস-পরিষ্কার করতে করতে নিজের অন্তঃকরণের উপদ্রব রূপী, আগাছা স্বরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ-দ্বেষ, কামনা-বাসনা ইত্যাদি নাশ করে দিয়েছিলেন। কবীর

বস্ত্র বুনতে বুনতে নিজের অন্তঃকরণ এবং 'জীবন-রূপী বস্ত্র' খানি সুন্দর ভাবে বুনন করে, তা পরমাত্মাকে সমর্পন করে দিয়েছিলেন। 'দাদু-ধুনিয়া' তুলা ধূনাই করার কাজ করতেন। সেই কাজ করার সময় তার ধূনাই যন্ত্র থেকে 'তুই, তুই' আওয়াজ হতো। তখন দাদুর মুখ থেকেও 'তুহী-তুহী' শব্দ বের হতো (অর্থাৎ হে ভগবান, সর্ব-রূপে একমাত্র 'তুমিই-তুমিই।) এরই নাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের সমন্বয়।

সমষ্টি কল্যাণের জন্য, ঈশ্বর প্রীতির জন্য অর্থাৎ "আমার ভগবান প্রসন্ন হোন" এরূপ ভাবনা রেখে নিষ্কাম ভাবে করা কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তিরূপে পরিণত হয়ে যায়। আর এমন নিষ্কাম কর্মযোগী ভক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সাংসারিক অনেক বিষয় ভোগ করলেও তাঁর প্রতিটি ক্রিয়াতেই পরমাত্মার পূজা হয়ে থাকে।

এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী ভক্তের নিদ্রা-ক্রিয়াকেও সমাধি রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। এমন নিষ্কাম কর্মযোগী ভক্ত নিজের অফিস, বাজার বা বাগান ইত্যাদি স্থানে যেখানেই পায়ে হেঁটে যান, সেখানে তাঁর পায়ে হেঁটে চলার ক্রিয়া পরমাত্মার প্রদক্ষিণ—পরিক্রমা হয়ে থাকে।

"সংচারঃ পদয়ো প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ।।"

এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী ভক্ত নিজের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথাবার্ত্তা বললে ঐ সময় তাঁর বচন-বাণীও পরমাত্মার স্তোত্র হয়ে যায়। এমনি ভাবে নিষ্কাম কর্মযোগীর প্রত্যেকটি কর্মই ভক্তি হয়ে যায়। আর সেই ভক্তি এতই উচ্চ স্তরের এবং বিশুদ্ধ যে তাঁর মধ্যে তখন আপনা থেকেই (স্বাভাবিক ভাবে) আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এমনি ভাবে সাধকের জীবনে কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞানের পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গম সৃষ্টি হলে তখন অন্তঃকরণের পর্দা বিশুদ্ধ হয়ে উঠে। আর তাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হলে আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। কর্ম, ভক্তি দ্বারা সিক্ত না হলে সেই কর্ম যেন মিথ্যাচার এবং ভন্ডামী (Hypocrisy)

হয়ে যায়। আর জ্ঞানও ভক্তি দ্বারা সিক্ত না হলে তা নিরর্থক হয়ে যায়। কর্ম এবং জ্ঞান উভয়েই ভক্তির তরলতার দ্বারা সিক্ত হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় তা অর্থহীন হয়ে যাবে। (ভক্তি কাকে বলে? এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এই গ্রন্থের ২৮নং পয়েন্টে করা হয়েছে।)

36. (viii) "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং" অর্থাৎ "অন্য ঝামেলা পূর্ণ কর্ম পরিত্যাগ করে তুমি নিয়তকর্ম (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম) কর" : শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ৮নং শ্লোকে ভগবান তা নির্দেশ করেছেন।

পরমাত্মার এই বিশাল জগত-যন্ত্রের মধ্যে আপনি ক্ষুদ্রাদি ক্ষুদ্র একটি অংশ (spare part) মাত্র। পরমাত্মার এই বিশাল চরকার ক্ষুদ্রাদি ক্ষুদ্র অংশকে প্রকাশ করার জন্য আপনি এক মাধ্যম মাত্র। তা সত্ত্বেও অর্থাৎ আপনি ঈশ্বর ইচ্ছার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এক অংশ হলেও, নিজেকে অত্যন্ত উপযোগী নিমিত্ত বা মাধ্যম বলে জানবেন। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হলেও নগণ্য নয়, গনণার মধ্যে অবশ্যই, কেননা কোন মিল কারখানায় কোন বড় যন্ত্রের একটি ছোট স্ক্রুও যদি শিথিল (ঢিলা) হয়ে যায় তাহলে সেই বিশাল মেশিনটির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ঈশ্বরের যোজনায় (কার্য করার রূপ-রেখায়) বিশাল কলকারখানা সজ্জিত করার শক্তি আপনার নেই, তা সত্য বটে, কিন্তু পরমেশ্বর আমার-আপনার মত ক্ষুদ্রতম কোন স্ক্রু যেখানে সংযুক্ত করেছেন তিনি সঠিক মনে করেই তা করেছেন। সৃষ্টির যাবতীয় কলকারখানা পরিচালনা করার শক্তি আমাদের নেই, এবং সেই দায়িত্বও আমাদের নেই, তা সত্য বটে, কিন্তু আমরা যদি সামান্য কোন কর্মকেও স্বেচ্ছায়, অবহেলা বশতঃ ত্যাগ করি অথবা স্বেচ্ছায় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে ভ্রান্তি, প্রমাদ, অসাবধানতা বশে দায়িত্বহীনতার কাজ করি এবং তাতে যদি সৃষ্টি কার্যে সামান্যও বিপত্তি বা সংকট সৃষ্টি হয়, তাহলে আমরা পরমেশ্বরের এই বিশাল মেশিনারী কার্যে ক্ষতির হেতু হবো এবং

এর উত্তর-দায়িত্ব আমাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। ফলে আমরা পরমাত্মার নিকট অপরাধী হবো, এই বিষয়টি আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

কোন একটি বিশাল দুর্গের মধ্যে অনেক সৈন্য যুদ্ধের জন্য অবস্থান করেন। তাঁদের কোন্ সৈন্যকে কোথায় কি কাজে নিযুক্ত করে, কি দায়িত্ব অর্পণ করা, এই সব কাজের পূর্ণ উত্তর-দায়িত্ব সেনাপতির উপর থাকে। সাধারণ সৈন্যদের তো শুধু মাত্র সেনাপতির নির্দেশমত, নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করতে হয়। সৈন্যদেরকে নিজ জাতি-বর্ণ এবং 'আমি-বোধ' পরিত্যাগ করতে হয় এবং সেনাপতিকে কেন্দ্রে অবস্থান করতে হয়। তদ্রূপভাবে আপনি যদি প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে 'আমি-পদরূপ-অহংকার' পরিত্যাগ করেন এবং পরমাত্মাকে কেন্দ্রে রেখে (অর্থাৎ সতত তাঁকে স্মরণ করে), শুধু মাত্র তাঁকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে, তাঁর ইচ্ছা এবং নির্দেশ মত কার্য সম্পাদন করেন, তাহলে আপনার প্রত্যেকটি কার্যে জয়-পরাজয়ের উত্তর-দায়িত্ব পরমাত্মার, আপনার নয়। পরমাত্মাই নিজ মস্তকে তা ধারণ করবেন।

আপনি যদি এইটুকু কথা ঠিকমত বুঝতে পারেন, তাহলে আপনার ছোট-বড় প্রত্যেকটি কর্মই তখন পরমাত্মার পূজার পুষ্পরূপে পরিণত হবে। তখন আপনার প্রত্যেকটি কর্মই ভক্তিময় হয়ে উঠবে, কর্মই তখন ভক্তি হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেকটি কর্ম হবে যথার্থ পূজা।

"your work is workship,
you have not to question why,
you have to do or die."

মানব জীবনের অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত নিত্যকর্ম স্বধর্ম (স্ব-কর্ম) পালন করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা মানে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার সমান বলে জানবেন। কারণ মৃত্যু এবং কাল ভগবানেরই স্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,

"মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১০।৩৪)

অর্থাৎ "আমি সব কিছুর হরণকারী (নাশ-কারী) মৃত্যু।"

"কালোহস্মি" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১১।৩২)

অর্থাৎ "আমি নাশকারী কাল।"

মৃত্যু ভগবানের এক বিভূতি (ঈশ্বরের ঐশ্বর্য)। তিনি কাল-স্বরূপ। ভগবান কালেরও কাল, 'মহাকাল'। তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ভীত না হলে তা সাধকের জন্য হবে 'সংসিদ্ধি' এবং নিজেকে পরমাত্মার নিকট সমর্পনের আনন্দ তাতে লাভ হবে।

এমনি ভাবে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কর্ম করা হলে সেই কর্ম সাধারণ কর্ম না হয়ে 'কর্ম যোগ' হয়ে থাকে। তখন প্রত্যেকটি কর্মই ভক্তিময় হয়ে উঠে। আর যিনি ভক্তিময় কর্ম করেন তাঁর অন্তঃকরণে জ্ঞান আপনা থেকেই অর্থাৎ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে উদয় (প্রকাশিত) হয়ে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়টি সমর্থন ও অনুমোদন করে রাজা জনকের উদাহরণ দিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।২০)

অর্থাৎ "জনকাদি ঋষিগণ আসক্তিরহিত কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি (পরম সিদ্ধি) লাভ করেছিলেন। তাই লোক-শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে তোমারও কর্ম করা উচিত।"

কর্ম মার্গ একটি স্বাধীন মার্গ। আর তা উচ্চ বা নিম্ন, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে, গরীব-ধনী সকলেই সুলভে (সহজে) গ্রহণ করতে পারেন।

36. (ix) নিয়ত কর্ম (শাস্ত্র বিহিত নিত্য কর্ম) স্বকর্ম এবং স্বধর্ম :

কর্মের সূত্র

আপনার প্রতিটি কর্ম পরমাত্মার পূজার উপকরণ হোক : ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন যে আপনাকে সংসিদ্ধি অর্থাৎ পরম সিদ্ধি লাভ করতে হলে অন্য কোন প্রকার সাধনা বা উপকরণের প্রয়োজন নেই। আপনি পরমাত্মাকে নিবেদন করার জন্য যেমন উত্তম পুষ্প এবং ফল সংগ্রহ করে তা পরমাত্মার চরণে অর্পণ করে থাকেন, তদ্রূপভাবে আপনার প্রতিটি কর্ম যদি পরমাত্মার চরণে সমর্পণ করেন তাহলে সেই শুভ কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই শুদ্ধ, নিষ্পাপ এবং রাগদ্বেষ রহিত হয়ে যায়। তাই আপনার উত্তম কর্ম ভগবানের চরণে সমর্পণ করে দিন।

আপনার গৃহে আপনার কোন চাকর আহার গ্রহণ করবে, তার জন্য আপনি যে খাদ্য প্রস্তুত করবেন, আপনার জামাতা বা কালেক্টর-সাহেব বা কোন মন্ত্রী মহোদয় বা কোন বিশেষ ব্যক্তি আপনার গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন করতে আসলে আপনি যে সকল আহার্য্য প্রস্তুত করবেন, এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে তা আপনি স্বয়ংই অবগত আছেন। তদ্রূপ ভাবে আপনার যাবতীয় কর্ম যা ভগবানকে সমর্পণ করবেন তা অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র এবং শুভ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কেননা পরমাত্মা জামাতা, কালেক্টর সাহেব এবং মন্ত্রী-মহাশয় থেকে অনেক অনেক বড়।

পরমাত্মা কেমন? :

"যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৮।৪৬ প্রথম লাইন)

অর্থাৎ "যে পরমাত্মা হতে সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে এবং যিনি এই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনুপরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন, সেই পরমাত্মাকে আপনার প্রতিটি কর্ম দ্বারা পূজা করুন, আপনার প্রতিটি কর্ম ভগবানের পূজার পুষ্প বানিয়ে দিন। তাহলে এর শুভ ফল হবে "সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৮।৪৬, দ্বিতীয় লাইন)। অর্থাৎ "কর্ম দ্বারা এরূপ পূজার ফলে মনুষ্য পরম সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করেন।"

তাতে আপনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করবেন। এর জন্য আপনাকে বনে গিয়ে উগ্র-উৎকট বা কঠোর তপস্যা, সাধনা করার আবশ্যকতা নেই। অথবা পদ্মফুল বা গোলাপ ফুল নিয়ে পূজা করারও আবশ্যকতা নেই। আপনি সংসারে অবস্থান করে নিয়ত-কর্ম দ্বারা ভক্তি-পূর্বক, ঈশ্বর প্রীত্যর্থে অর্থাৎ পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য কর্ম করলে আপনার সেই প্রতিটি কর্মই পরমাত্মার পূজার পুষ্প হয়ে যাবে।

ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় স্পষ্ট বলেছেন,

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৯।২৭)

অর্থাৎ "হে অর্জুন, তুমি যা কিছু কর্ম কর, যা কিছু ভোজন কর, হবন কর, দান কর, তপস্যা কর সে সমস্তই আমাকে সমর্পণ করে দাও।"

আপনি যা কিছু নিয়ত কর্ম করবেন, তার ফল ভগবানকে সমর্পণ করে দিন। তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনার প্রত্যেকটি কর্মই আপনা থেকেই (স্বাভাবিক ভাবেই) শুদ্ধ হয়ে উঠবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৮।৪৫, প্রথম লাইন)

অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত মানুষ ভগবৎ প্রাপ্তি রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

আপনি নিয়ত কর্মকে সঠিক ভাবে পালন করে চলুন কিন্তু অপর ব্যক্তির কর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না। আপনি যেন সংসার নাট্য শালায় নাট্য-মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। নাটকে আপনার চরিত্রটি সঠিক ও সুন্দর ভাবে রূপায়ন করুন। অপর ব্যক্তি তার চরিত্র অভিনয় করায় কোন ভুল করলে

ম্যানেজার-ভগবান তার বেতন কেটে নিবেন (অর্থাৎ কর্মফলের বিচার করবেন) অথবা তাকে বের করে দিবেন। অপর ব্যক্তি তার কাজ সঠিক ভাবে করছেন কিনা তা দেখবার দায়িত্ব আপনার নয়, এ কাজ ম্যানেজার-পরমাত্মার। আপনি সেদিকে দৃষ্টি দিবেন না। অপরের ঝামেলায় আপনি বৃথা জড়িয়ে পড়বেন না। আপনি নিজ চরিত্র অভিনয়ের বিষয়ে খেয়াল রাখুন, নিজ কর্ত্তব্য সঠিক ভাবে পালন করুন। অন্য ব্যক্তি তার চরিত্রের অভিনয় সঠিক ভাবে পালন না করলেও ম্যানেজার পরমাত্মা আপনার কোন ক্ষতি হতে দিবেন না।

"পরাই মূর্খতা কে লিয়ে মুখ মে নহী জহর তু লেনা।"

অর্থাৎ "অপর ব্যক্তির মূর্খতার জন্য আপনি আপনার মুখে বিষ আনয়ন করবেন না (অর্থাৎ পরচর্চা, পরনিন্দা ইত্যাদি) করবেন না।" **"The world is a stage where we are all actors."**

পুত্র, পিতা, স্বামী, শেঠ বা চাকর ইত্যাদি যে রূপে অভিনয়ের জন্য যে চরিত্র এই বিশ্ব নাট্য-মঞ্চের উপর পালন করার দায়িত্ব আপনার জন্য স্থির হয়ে আছে, সেই অভিনয় কার্যগুলি সঠিক ও সুন্দর ভাবে আপনার দ্বারা রূপায়ন ও সুসম্পন্ন করা হলে ম্যানেজার-পরমাত্মা আপনার উপর খুব প্রসন্ন হবেন। আপনি অপর লোকদের কার্যকলাপের বিষয়ে চিন্তা করবেননা এবং নিরর্থক ঝামেলায় আবদ্ধ হবেন না। আপনি যে কোন কর্মই করবেন তা এরূপ ভাবনা নিয়ে করুন, "আমি ভগবানেরই পূজা করছি।"

"পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ।।"

আপনি সংসারে যে কোন বৈষয়িক কর্মই করুন না কেন, মনে করুন, "আমি পরমাত্মারই পূজা করছি।" নিদ্রা যাবার সময়ে ভাবনা রাখুন, "আমি পরমাত্মার কোলে মস্তক রেখে তাঁর ধ্যান ও সমাধিতে যাচ্ছি।" আপনি

অফিস, বাজার বা অন্য যে কোন স্থানে যে কোন কর্মে নিয়োজিত হচ্ছেন, আপনার পা যে স্থানেই সংচালিত (চালিত) হচ্ছে জানবেন সেখানে আপনি পরমাত্মাকেই প্রদক্ষিণ করছেন। কেননা ভগবান বিভু, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী। আপনার গৃহ, কার্যালয়, বাজার ইত্যাদি স্থানে আপনি যে কোন বার্ত্তালাপ করছেন, মনে করুন সেই বাণী দ্বারা আপনি পরমাত্মার স্তোত্র পাঠ করছেন। এরূপ দৃঢ় ভাবনা রেখে যদি আপনি আপনার প্রতিটি কর্ম করেন, তাহলে আপনার প্রতিটি কর্মই ভক্তিময় হয়ে উঠবে। তাহলে আপনাকে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, চিৎকার করে গান করে বা ভগবান মহাদেবের মন্দিরে দৌড়াদৌড়ী করে, ভক্তি প্রদর্শন করে, দম্ভ করে ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য মিথ্যা-প্রয়াস করার আবশ্যকতা থাকবে না।

"স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য।" (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৮।৪৬)

আপনি নিয়ত কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনা (অর্থাৎ পূজা) করুন। কর্ম পূজা করার জন্য চন্দন, পুষ্প, মাল্য, অক্ষত, হালুয়া-নৈবেদ্য ইত্যাদি পূজা-উপকরণ না হলেও চলবে। আপনার প্রতিটি কর্মই পূজা অর্চনার উপকরণ। পূজার ভাবনা বিনা কর্ম করা নিরর্থক, বৃথা। এক মেথর পূজার দৃষ্টি বা ভাবনা নিয়ে ঝাড়ু দ্বারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করলে ভগবানের দৃষ্টিতে সেই মেথরের সেই কর্মটিও পরমাত্মার অতি উত্তম এক পূজাকর্ম হবে। পক্ষান্তরে যদি এক ব্রাহ্মণ অর্চনার ভাবনা বিনা শিব লিঙ্গে পূজা করেন, তাহলে তা নিরর্থক কষ্ট ও চেষ্টা করা হবে মাত্র।

পরমাত্মা তাঁর এই মহা-বিশাল বিশ্ব-যন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি নির্দিষ্ট কর্ম প্রদান করে দিয়েছেন। যার দ্বারা, যে সময়, যে কর্ম করা স্থির হয়ে আছে, তাকে সেই সময় সেই কর্মই করতে হবে, একে নিয়ত কর্ম, স্বকর্ম বা স্বধর্ম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রতি ব্যক্তিকে সচেতন হয়ে সাবধানতার সাথে নিজের স্বকর্ম, স্বধর্মের কর্ম করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, তা ভগবানের নির্দেশ। নিজের স্বধর্ম পরিত্যাগ করে পলায়ন করা, যেমন

বিবাহ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে স্ত্রী এবং শিশু-সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করে তাদেরকে আশ্রয়হীন করে বনে জঙ্গলে পলায়ন করে ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে ভন্ড-সন্ন্যাসী-বাবা হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। এরূপ ভন্ড সাধু বা পলায়ন-কারী ব্যক্তি পরমাত্মার নিকট থেকে দন্ড লাভের পাত্র। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৩৫, দ্বিতীয় লাইন)

কোন গৃহস্থের স্বধর্ম হলো গৃহস্থ-ধর্ম পালন করা। কিন্তু তিনি যদি মানসিক স্থিতি (পূর্ণ বৈরাগ্যবান স্থিতি) লাভ না হওয়া সত্ত্বেও জিদ্ করে গৃহস্থ ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং তার জন্য পরধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্মকে স্বীকার করে ভ্রান্তি বশে গৃহ থেকে পলায়ন করেন স্ত্রী-পুত্রকে অনাথ করে, তাহলে তা ঠিক হবে না। তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে, কোন সন্ন্যাসী যদি তার স্বধর্ম যথা—ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণসংযম পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ের আরাম বা সুখের জন্য গৃহস্থের ধর্ম-কর্ম পালন করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই ভয় এবং দুঃখে পতিত হবেন। (অর্থাৎ গৃহস্থের জন্য সন্ন্যাসীর ধর্ম-কর্ম পর-ধর্ম, আর সন্ন্যাসীর জন্য গৃহস্থের ধর্ম-কর্ম পরধর্ম।)

পরমাত্মা মনুষ্যকে যে স্বধর্ম, স্বকর্ম, নিয়তকর্ম নিশ্চিত রূপে স্থির করে দিয়েছেন, তা তিনি সম্পূর্ণ বিবেক-বিচার পূর্বকই করেছেন। কি করণীয়, এ বিষয়ে বিচার করার যোগ্যতা সাধারণ মানুষের চেয়ে পরমাত্মার অনেক অনেক বেশি রয়েছে। যদি কোন অজ্ঞান ব্যক্তি মনে করেন এবং বলেন, "ওরে, পরমাত্মা আমার মস্তকের উপর এই কর্ম কেন চাপিয়ে দিয়েছেন?" এরূপ বলে পরমাত্মার উপর দোষারোপ করা আর পরমাত্মার ইচ্ছাকে অনাদর করে স্বধর্ম ত্যাগ করা একই কথা। তা ঈশ্বরের যোজনায় (পরিকল্পনায়) তার অনধিকার হস্তক্ষেপ করার সমান। তা ঈশ্বরের অধিকার অনুসারে তাঁর নির্দেশ বিরুদ্ধ কাজ করা হবে। জগৎ-সৃষ্টির এই বিশাল

কারখানায় আপনিতো এক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ (spare-parts) মাত্র। জগৎ কর্ত্তা পরমাত্মা তার এই বিশাল জগৎ যন্ত্রের মধ্যে সঠিকভাবে বিচার করেই আপনাকে যে স্থানে সংযোজিত ও উপস্থাপন করার আবশ্যকতা বা উচিত বলে স্থির করেছেন সেখানেই তিনি আপনাকে নিযুক্ত করেছেন এই বিশ্ব যন্ত্র পরিচালনা করার জন্য। আপনার কর্ত্তব্য হলো নিয়ত কর্ম, স্বকর্ম, স্বধর্ম নিষ্ঠার সাথে, পরমাত্মার প্রীত্যর্থে, তাঁরই নির্দেশ মত সঠিক ভাবে পালন করা। এতে আপনার অধিক, নিরর্থক, ভুল বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করার আবশ্যকতা নেই।

মনে করুন, "আমি এল. এল. বি. পাশ করে একজন উকিল হলাম। পরে ভেবে দেখলাম যে আমি যদি উকিল না হয়ে একজন এম. বি. বি. এস. ডাক্তার হতাম, তাহলে হয়ত এর চেয়ে দশ গুণ অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারতাম।" আমি যদি পাগলের মত এরূপ চিন্তা করে আজ আমার পঞ্চাশ বছর বয়সে একজন উকিলের স্বধর্ম ওকালতি পেশা পরিত্যাগ করে একটি হাসপাতাল খুলে বসে যাই, তাহলে তা হবে স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্মকে গ্রহণ করা। তা করা হলে আমি হয়ত অনেক লোকের মৃত্যুর নিমিত্ত- কারণ হয়ে উঠবো। কেননা "পরধর্ম ভয়াবহঃ।"

প্রত্যেক মানুষের স্বকর্ম নিয়তকর্ম পূর্ব থেকে অবশ্যই স্থির (নির্দিষ্ট) হয়ে আছে। শিশুর জন্ম হলেই তার নিজের স্বকর্ম-স্বধর্ম কি সে তা জানতে পারে। সে ক্ষুধার্ত হলে কোন্ স্থানে দুধ পান করতে হবে, কি ভাবে মাতৃ-স্তনের দুধ চুষতে (sucking) হবে তা সে জানে এবং এর পিছনে পরমাত্মার অলৌকিক প্রেরণার শক্তি রয়েছে। মাতৃস্তনের দুধ চুষারূপ স্বধর্ম শিশু পরমাত্মার প্রেরণায় জানে এবং এমনিভাবে সে তার নিয়ত কর্ম স্বভাবের বশীভূত হয়ে পালন করে থাকে। শিশুর মাতাকে তা শেখানোর আবশ্যকতা হয়না। মনে করুন আপনার ঘোড়া আছে। ওর পিপাসা পেলে কোন প্রকারে ওকে জলপান করানো আপনার স্বকর্ম-স্বধর্ম।

কিন্তু যদি ওর পিপাসাই না লাগে, তাহলে আপনি ওকে জোর করে জল পান করাতে পারবেননা।

"you can take the horse to the stream but you cannot make him drink."

তদ্রূপভাবে বাল্যাবস্থায় পড়াশুনা করা মানুষের একপ্রকার স্বকর্ম-নিয়তকর্ম-স্বধর্ম। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকারী গৃহস্থের জন্য চাকুরী, কাজ-কর্ম করে অর্থ উপার্জন করা, ব্যবসা করে ন্যায়-নীতির মাধ্যমে অর্থ-উপার্জন করা, স্ত্রী-পুত্রাদিকে পালন-পোষন করা এবং সমাজের অন্যান্য আশ্রম-বাসীদের সেবা করা ইত্যাদি তার নিয়ত কর্ম। তদ্রূপ ভাবে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস জীবনের স্বকর্ম-স্বধর্ম-নিয়তকর্ম পৃথক পৃথক রূপে স্থির হয়েছে। আর নিজ জীবনের এসব স্বকর্ম স্বধর্ম তাঁদেরকে নিষ্ঠাপূর্বক, ঈশ্বর প্রীত্যর্থে করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের স্বধর্ম শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তা তাদের নিয়ত কর্ম।

মাতা-পিতা, পুত্র, স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে স্বকর্ম-স্বধর্ম পালন করে থাকেন। অপরের স্বকর্ম-স্বধর্ম-নিয়তকর্মে কোনরূপ বিক্ষেপ সৃষ্টি না করা কর্ত্তব্য। আর নিজের স্বধর্মকে পরিবর্ত্তন করতে নেই।

ঠান্ডার সময়ে গরম বস্ত্র পরিধান করা স্বধর্ম। গ্রীষ্মকালে শরীর ঠান্ডা থাকে এরূপ আহার এবং বস্ত্র পরিধান করা স্বধর্ম। চাতুর্মাস-বর্ষায় ছাতা ব্যবহার করা স্বধর্ম। প্রাতঃকালে দন্ত-মার্জন করা, শৌচাদি ক্রিয়া করা, দুপুর বেলায় চাকুরী বা ব্যবসা ইত্যাদি দ্বারা অর্থ উপার্জন করা, রাত্রিতে ভগবদ্ স্মরণ করা ইত্যাদি মানুষের নিয়ত কর্ম। এমনিভাবে বিভিন্ন ঋতু, সময়, কাল এবং ভিন্ন অবস্থায় স্বধর্ম পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। দেশ-কাল পরিস্থিতি অনুসারে, সে বিষয়ে খেয়াল রেখে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্বধর্ম-স্বকর্ম নিয়তকর্ম অবশ্যই পালন করা উচিত।

37. (i) পাপ দৃষ্টিগোচর হলেও পুণ্যকর্ম গোপন ভাবে করুন : চুরি করাও এক প্রকার কলা। নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিচার না করলে চুরি করা তো খুব কঠিন এক কলা। চুরির অর্থ হলো গোপন ভাবে কিছু করা যা

সংসারের অন্য কোন লোক জানতে বা বুঝতে না পারে। চুরির সময়ে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেলে সে চোর পাকা-চোর বলে গণ্য হবে না।

ধরুন, আমার গৃহে কোন চোর প্রবেশ করলো। দিনের বেলায় যথেষ্ট আলোর মধ্যেও যে সকল বস্তু আমার পক্ষে খুঁজে বের করা মুশকিল হয়, চোর সেই সকল সামগ্রী রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে, অপরিচিত গৃহে, সামান্যও আওয়াজ না করে, খুঁজে বের করে নিয়ে এমন সাবধানের সাথে পলায়ন করে থাকে যে যা আমি জানতেই পারি না। চোর যদি নিজের কোন চিহ্ন রেখে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে এখনও কাঁচা চোর, চুরির কাজ শিক্ষা করছে মাত্র, এখনও সে পাকা চোর হয়নি।

এমনি ভাবে পরমাত্মার প্রকাশ-স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত করা, এও এক প্রকার অলৌকিক চুরি। যদি কেউ জানতে পারে যে আপনি সত্যের অনুসন্ধান বা খোঁজ করছেন, তাহলে এরূপ প্রকাশ হয়ে যাওয়া সত্যের খোঁজ করার জন্য, এক প্রকার বাধক স্বরূপ।

যীশু খ্রীস্ট বলেন, "আপনার বাম হাত কি করছে তা আপনার ডান হাত যেন জানতে না পারে এবং আপনার প্রার্থনা এতটাই গোপনীয় হওয়া আবশ্যক যে পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ যেন তা জানতে বা শুনতে না পারে।"

নিজের প্রার্থনা পরমাত্মা শুনতে পারছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রতিবেশী এবং মহল্লার লোক তা শুনতে পায়। পরমাত্মা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করছেন, কি না করছেন, এ বিষয়ে আমরা বিশেষ চিন্তা বা খেয়াল করিনা, কিন্তু প্রতিবেশী তা শ্রবণ করুক, সেদিকে বিশেষ খেয়াল করে থাকি এবং তদ্রূপ উপযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা অনেকেই জোরে এবং উচ্চ আওয়াজের সাথে চিৎকার করে প্রার্থনা করে থাকি।

সাধারণতঃ মানুষ ধর্ম এবং পূণ্য-কর্ম ঢাক-ঢোল বাজিয়ে করে থাকেন। আর অধর্ম, পাপ-কর্ম, চুরি ইত্যাদি গোপনে করে থাকেন। শাস্ত্র এবং সাধু

সন্তগণ এর উল্টো কথা বলে থাকেন। তাঁরা সঠিক কথাই বলেন। তাঁরা বলেন, "আপনি পাপ-কার্য যেমন গোপনে করে থাকেন তদ্রূপভাবে ধার্মিক-কার্য, পূণ্য কর্ম গুপ্তভাবে করুন। পাপ করতে হলে প্রকাশ্যে করুন, পুণ্য গোপনীয়তা বজায় রেখে করুন। কেননা আপনি প্রকাশ্যে পাপ করতেই পারবেন না। তাই আপনাকে পাপকার্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বিরত থাকতেই হবে।"

যা করা উচিত নয়, তা আপনি করছেন। আর যা বাস্তবিক আপনার করা কর্ত্তব্য, তা আপনি করছেন না। যা করা কর্ত্তব্য, তা যদি আপনি কোনরূপ দম্ভ বা অহংকার সহকারে না করেন, ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে, গোপন ভাবে করেন তাহলে তা আপনার জন্য শ্রেয় হবে, আপনাকে হোঁচট বা ধোঁকা খেতে হবেনা। দুঃখ পেতে হবে না।

পাপ আপনি খোলাখুলি ভাবে করতে পারবেননা। আর আপনি যদি বাস্তবিক পূণ্য না করে শুধুমাত্র ভন্ডামী, ধোঁকাবাজী করেন অথচ পূণ্য কর্ম করছেন বলে খোলাখুলি ভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অন্যের নিকট প্রদর্শন বা প্রচার করেন তাহলে হয়ত প্রথমে সাধারণ মানুষকে মূর্খ বানাতে পারেন বটে, কিন্তু যেহেতু বস্তুত আপনার উদ্দেশ্য ও কর্ম সঠিক নয় তাই তা পূণ্য হবেনা, সাধারণ মানুষও একদিন না একদিন জানতে এবং বুঝতে পারবেন যে আপনি বস্তুতঃ পূণ্য করছেননা, গোপনীয়তা অবলম্বন করে পাপই করছেন, কেবল প্রচার, দম্ভ ও ভন্ডামী করছেন এবং ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অন্য মানুষের সামনে প্রদর্শন করছেন মাত্র।

(ii) পাপ বা পূণ্য দৃষ্টিগোচর (expose) হলেই তাদের ফল তিরোহিত (লুপ্ত/evaporate) হয়ে যায় : আপনি যে সকল পূণ্য কর্ম করেন যথা—দান করেন, ধর্মীয় কাজে অর্থ ব্যয় করেন, আর যখন তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং আপনার ফটো এবং প্রশংসা খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়, হয়ত কোন স্থানে আপনার নামে প্রশংসা সূচক বোর্ড

লাগানো হয়, এভাবে আপনার পূণ্য কর্মের খ্যাতি চারিদিকে প্রকাশিত (expose) হলে জানবেন শীঘ্রই এই পূণ্য ফল নাশ (evaporate) হয়ে যাবে। এসকল পূণ্য কর্মের ফল যথা — আপনার প্রশংসা, যশ-গাথা ইত্যাদি আপনাকে দিয়ে তা তৎক্ষনাৎ নাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পুনঃ সেই কর্ম সঞ্চিত রূপে জমা হয়ে, প্রারব্ধ রূপে দ্বিতীয়বার ফল বা সুখ প্রদানের জন্য উপস্থিত হতে পারেনা।

এ বিষয়ে মহাভারতে রাজা যযাতির কাহিনীটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ রাজা অসংখ্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি পূণ্য কর্ম করেছিলেন। এর প্রভাবে তিনি ইন্দ্র-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন। রাজা যযাতি স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি সিংহাসন থেকে নীচে নেমে এসে রাজা যযাতিকে ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। তারপর ইন্দ্র সিংহাসনের নীচে দাঁড়িয়ে করজোড়ে রাজা যযাতির পূর্বকৃত যজ্ঞ, দান, তপস্যার বিষয়ে বিস্তার পূর্বক যশোগাথা সেই ভরা সভায় সবাইকে শুনিয়ে কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

ইন্দ্র বললেন, "হে রাজন, আপনি অনেক হীরা-মানিক, মোতি ইত্যাদি দান করেছেন।" রাজা মস্তক নেড়ে তা স্বীকার করলেন। ইন্দ্র বললেন, "রাজন, আপনি অনেক সুবর্ণের মোহর দান করেছেন। আপনি স্বর্ণ দ্বারা শিং বাঁধানো, প্রচুর দুগ্ধদান কারী অসংখ্য গাভী দান করেছেন, অসংখ্য কূপ, পুকুর, জলাশয় খনন করিয়েছেন, অসংখ্য ধর্মশালা, পাঠশালা, হাসপাতাল প্রস্তুত করেছেন। আপনি অসংখ্য ধর্মক্ষেত্র খুলেছেন, রাজ্যে সকল গরীবদের শিক্ষা, অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন, এর ফল স্বরূপ আপনার রাজ্যে বর্তমানে কোন গরীব বা নিরক্ষর ব্যক্তি নেই। আপনি অনেক যজ্ঞ করেছেন এবং গো, ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষি, সাধু-সন্তদের খুব সন্তুষ্ট করেছেন।" রাজা মস্তক নেড়ে তা স্বীকার করলেন।

এমনিভাবে রাজা যযাতির দ্বারা কৃত এক একটি পূণ্যকর্ম ইন্দ্র সেই

সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলকে শুনালেন। রাজা যযাতি ইন্দ্রপদে বসে সম্মতি সূচক মস্তক নেড়ে স্বীকার করে গেলেন। বর্ণনা শেষ হওয়া মাত্রই ইন্দ্র রাজাকে বললেন, "মহারাজ, এবার আপনি ইন্দ্রপদ থেকে নীচে নেমে আসুন। কারণ আপনার সকল পুণ্যকর্ম সমাপ্ত, (expose) হয়ে গেছে। তাই এখন আপনি আর ইন্দ্রের পদে বসার অধিকারী নন। আপনার পুণ্যফলের হিসাব ইন্দ্রের এই ভরা সভায় প্রশংসার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনার প্রশংসা ও গুণগান সবাইকে শুনানো হয়েছে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ আপনার পুণ্যর ফল পেয়ে গেছেন। পুণ্য ফল দিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। এখন সেই সকল কর্মগুলি সঞ্চিত রূপে আর জমা হওয়ার নয় এবং প্রারব্ধ হয়ে সেই কর্ম আপনাকে পুনঃ আর কোন ফল দিতে পারবে না।

তদ্রূপ ভাবে বলা যায় যে পাপ কর্মের প্রকাশের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। আপনি যদি পাপ কর্ম করে এর জন্য অনুশোচনা করেন এবং তা প্রকাশ করে দেন, তাহলে এর ফল সমাপ্ত, তিরোহিত (evaporated) হয়ে যাবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কম বয়সে যে সকল পাপ কর্ম করেছিলেন, যেমন তিনি চাকরের বিড়ির ভাঙ্গা টুকরা পান করেছিলেন, মাংস খেয়েছিলেন, বেশ্যার গৃহে গমন করেছিলেন, পিতার জামার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছিলেন, পিতার আসন্ন মৃত্যুর সময়ে বিকার-গ্রস্ত (আসক্ত) হয়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিলেন। যে সকল পাপ-কর্ম তিনি ইহ জীবনে করেছিলেন সে সমস্তই তিনি তাঁর লিখিত "আত্ম-কথায়" অকপটে স্বীকার করে প্রকাশ করে গেছেন। এর জন্য তিনি অনুশোচনাও করেছিলেন। তাই তাঁর সেই সকল পাপ কর্মের ফল তিরোহিত (evaporate) হয়ে গিয়েছিল। এমনি ভাবে "ঠক্করবাবা", 'ভিক্ষু অখন্ডানন্দ' প্রভৃতি মহান সন্তগণ পরস্ত্রী গমন করে পাপকর্ম করেছিলেন, তা তাঁরা নিজেদের জীবন-কথায় সাহসের সাথে নির্মল ভাবে সম্পূর্ণ বর্ণনা করে গেছেন।

আর এভাবে পাপ-কর্মের প্রকাশ এবং অনুশোচনা করে তাঁরা তাঁদের অশুভ কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এবং তাঁরা মনের ভার ও ব্যথা অনুশোচনা দ্বারা ভোগ করে তা হাল্কা করে দিয়েছিলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব প্রকাশ করেছিলেন, "আমার মাতা নিম্ন বর্ণের মৎস্য-জীবির কন্যা ছিলেন।" যদি তিনি লিখতেন, "আমার মা এক নাগর ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন", তাহলেও কে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতো? শ্রী নারদ মুনী শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং বলেছেন, "আমার মা সাধু-সন্নাসীদের আশ্রমে কাপড় পরিস্কার করতেন, বাসন মাজতেন, ঝাড়ু লাগানোর কাজ করতেন এবং সাধু সন্ন্যাসীদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করতেন।" মহাপুরুষ এবং সন্তগণ নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি গুলি স্বচ্ছ হৃদয়ে, স্বয়ং সৎ-সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁরা লোক নিন্দার কোনও চিন্তা বা ভয় করেননি। আর তাই ঐ সকল মহান আত্মাকে মহাপুরুষ বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। তাঁরা সত্য কথাকে সরলভাবে, সাহসিকতার সাথে ব্যক্ত করেছেন। আর তাই সংসারে কেউই তাঁদের নিন্দা করার সাহস করতে পারেনা। আমরা পাপ-কর্ম গোপন করে রাখি। তাই আমাদের পাপের ফল কেঁদে কেঁদে ভোগ করতে হয়। সতীরানী, তোরল জাডেজাকে বলেছিলেন, "হে জাডেজা, তুমি নিজের পাপ উচ্চস্বরে স্বীকার করে নিজের ধর্মকে রক্ষা করেছ, আমি তোমার জীবন-নৌকাকে ডুবতে দিবনা।"

জেসল জাডেজাও নিজের পাপকে প্রকাশ করে বলেছিলেন, (ভাবার্থ) "আমি কুমারী কন্যাকে লুট (বলাৎকার) করেছি। হে সতীরানী, জঙ্গলে ময়ুর মেরেছি, আমার মস্তকে যে পরিমাণ চুল রয়েছে আমি তত সংখ্যক কুকর্ম করেছি।"

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। অনেক জন্ম-জন্মান্তরের কামনা বাসনা গুলি অন্তঃকরণের পর্দার উপর অঙ্কিত হয়ে পতিত হয়। তারপর এর প্রভাবে মানুষ কখনও কোন ঘোরতর পাপকর্ম করে থাকে। কিন্তু এর

জন্য যদি সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধ মন ও অন্তঃকরণের দ্বারা অনুশোচনা করেন এবং ভগবানের সম্মুখে করজোড়ে ব্যাকুল হয়ে ছোট শিশুর মত কেঁদে কেঁদে অশ্রু বর্ষণ করে উচ্চ-স্বরে চিৎকার করেন, তাহলে তার জীবন তরীটি সংসার সাগরে ডুবে যাওয়ার হলেও নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই ভগবান অবশ্যই তা রক্ষা করে থাকেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন এক লাখ টাকার ষ্টাম্পের উপর দস্তাবেজ (লিখিত দলিল বা সনদ) প্রস্তুত করে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় যেন বুক ঠুকে (দৃঢ়তার সঙ্গে) ভক্তদের আশ্বস্ত করে বলেছেন,

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।। (৯।৩০)
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছন্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।" (৯।৩১)

অর্থাৎ "অতিশয় পাপী ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমার ভক্ত হয়ে আমাকে সতত ভজন করলে তাঁকে সাধু মনে করবে। কেননা সে সম্যক (সঠিক) কর্ম নিশ্চয় করে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে উঠে এবং শাশ্বত (স্থায়ী) ও পরম শান্তি লাভ করে। হে অর্জুন, তুমি সত্য ও নিশ্চয় জানবে যে আমার ভক্তের নাশ হয়না।" (৯।৩০-৩১)

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। (১২।৭)

অর্থাৎ "হে অর্জুন, অনন্য ভক্তদের আমি শীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার সমুদ্র হতে উদ্ধার করে থাকি।"

অতিশয় পাপীও ভগবানের কাছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনুশোচনা করে ব্যাকুল হয়ে রোদন করলে ভগবান তাঁকে শীঘ্রই সংসার-দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেন। ভগবান ভক্তের নাশ হতে দেননা। এমন আশ্বাসন ভগবান বিনা আর কে দিতে পারেন?

জপমালা না ঘুরিয়ে, রামনাম না নিয়ে, চন্ডীপাঠ না করে, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা পারায়ণ না করে, শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহের কথা শ্রবণ না করলেও চলবে কিন্তু নিজেকে পাপী বলে অনুভব করে (কেননা নিজের কৃত পাপ নিজে ব্যতীত অন্য কেহ জানে না) এবং সেই পাপের তালিকাটি তুলে ধরে ভগবানের নিকট বসে গভীর অনুশোচনার সাথে কেঁদে কেঁদে তা সদা পাঠ করলেও আপনি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবেন। কিন্তু কঠোর হৃদয়ের অধিকারী আমরা এই কাজ করার জন্য প্রস্তুত নই। কেবল মালা জপ এবং পারায়ণ করে দম্ভভরা ভাবনা নিয়ে দুনিয়াকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে হাসতে হাসতে করা পাপ কর্মের ফল দুঃখ কেঁদে কেঁদে আমরা পেট ভরে (সম্পূর্ণ রূপে) ভোগ করে থাকি।

38. পুরুষার্থ দ্বারা প্রারব্ধ পরিবর্ত্তন করা যায় কিনা? : প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করার জন্য জীবের প্রারব্ধ কর্মের অনুরূপ শরীর প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং সেই শরীর বেচে থাকা অবস্থায় সকল প্রারব্ধ কর্ম গুলিকে ভোগ করতে হয়। তারপরে তার দেহ ত্যাগ হয়। যে প্রারব্ধগুলিকে ভোগ করার জন্য দেহ ধারণ করতে হয়েছে তা ভোগ সম্পূর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত তাকে দেহ ধারণ করতেই হবে।

শরীর টিকে (বেচে) থাকা অবস্থায় ভোগ করতে হয় এমন প্রারব্ধ কর্মগুলিকেপ্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা — 1. অতি তীব্র প্রারব্ধ 2. তীব্র প্রারব্ধ 3. মন্দ প্রারব্ধ এবং 4. অতি মন্দ প্রারব্ধ।

1. অতি তীব্র প্রারব্ধ : যতই প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করা হোক না কেন, অতি তীব্র প্রারব্ধ রোধ করা যায় না। জীবাত্মা যে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে থাকে, তা অতি তীব্র প্রারব্ধ কর্মেরই ফল। অতি তীব্র প্রারব্ধ কোন প্রকারেই, কতই না প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করা হোক, তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন গাধাকে ঘোড়া অথবা কোন ঘোড়াকে উঁট বা পাখী রূপে বদলানো যাবে না।

মানুষের নিজ শরীর অতি তীব্র প্রারব্ধ কর্ম বশেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর এতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যার পুরুষ শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে স্ত্রী শরীরে পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে না। তদ্রূপভাবে স্ত্রী শরীর লাভ হয়েছে, তা পুরুষ শরীরে পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে না। পূর্ব-জন্মের করা মহান-পূণ্য-কর্ম অথবা অতিঘোর পাপ-কর্মই অতি তীব্র প্রারব্ধ প্রস্তুত করে যা পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে না। অতি তীব্র প্রারব্ধ হলো যেন ধনু থেকে নিক্ষেপ করা বাণ। নিক্ষেপ করা বাণকে পুনঃ ধনুর মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ ভাবে পূর্ব জন্মের করা মহান পূণ্যকর্ম অথবা ঘোর পাপকর্ম পুরুষার্থ দ্বারা রোধ বা নাশ করা যায় না।

2. তীব্র প্রারব্ধ : তীব্র প্রারব্ধ প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা প্রারব্ধের কিছুটা অংশ বদলানো যেতে পারে এবং আংশিক রূপে লঘু বা হাল্কা করা যেতে পারে। তীব্র প্রারব্ধকে লঘু করার জন্য প্রয়োগ করা প্রবল পুরুষার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়না। কেননা প্রারব্ধ তীব্র হলেও ক্রিয়মাণ কর্ম সৃষ্টি আমরা নিজ ইচ্ছা অনুসারে, স্বাধীন ভাবে করতে পারি। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ভগবানের নাম জপ বা স্মরণ, সৎ-সঙ্গ এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম অভ্যাস করা এবং সেই সকল নির্দেশ মত আচরণ করা কর্ত্তব্য। এরূপ পুরুষার্থ দ্বারা মানুষ অতিশয় দুঃখকে লঘু করে দিতে পারে, এ কথা সত্য।

(3) মন্দ প্রারব্ধ এবং (4) অতি মন্দ প্রারব্ধ :

এই উভয় প্রারব্ধই প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা নিষ্ফল বা রোধ করা যেতে পারে। প্রারব্ধবাদীদের মতানুসারে সব প্রারব্ধ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেনা, যদি তা হতো তাহলে বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত মার্গ দর্শন অনুসারে পুরুষার্থ একেবারে বৃথা হয়ে যাবে। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। মন্দ এবং অতি মন্দ প্রারব্ধকে নিষ্ফল বা

রোধ করার জন্য শাস্ত্র এবং সন্তগণের দ্বারা প্রস্তুত শাস্ত্র বিহিত কর্ম (Prescribed action) এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম (Prohibited action) কে লক্ষ্য রেখে তদ্রূপ ভাবে শুভ কর্ম করা এবং অশুভ কর্ম ত্যাগ করার পুরুষার্থ মানুষ অবশ্যই করতে পারেন এবং তা করাও আবশ্যক। বলা হয়ে থাকে পুরুষার্থ বিনা প্রারব্ধ অন্ধ। (অর্থাৎ অন্যথায় প্রারব্ধ অসহায় রূপে ভোগ করতে হয়।)

প্রারব্ধ কর্ম, 'অদৃষ্ট' নামে পরিচিত (অর্থাৎ প্রারব্ধের এক নাম অদৃষ্ট, যা দেখা যায় না অথচ কার্য দ্বারা অনুভব হয়।) অতীতকালে বা পূর্ব জন্মে নিজের দ্বারা কৃত কর্ম কিরূপ ছিল এবং তা কি রকমের প্রারব্ধ কর্ম রূপে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তা আমরা জানিনা। মানুষ নিজের প্রারব্ধ কর্মের ফল সম্বন্ধে অজ্ঞাত। তাই প্রারব্ধকে অদৃষ্ট (যা দৃষ্ট নয়) নাম দেওয়া হয়েছে। প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ মানব জীবনের যেন একই 'দাঁড়ি-পাল্লার' দুটি পাল্লা। এক পাল্লায় অদৃষ্টরূপী 'বাট-খাড়া' (ওজন) রয়েছে। অন্য পাল্লায় রয়েছে মানুষের নিজ-শক্তি অনুসারে বিবেক বুদ্ধি উপযোগ করে পুরুষার্থরূপী দ্রব্য বা পদার্থ ভর্তি করার প্রয়াস (কর্ম করার চেষ্টা)।

39. মানুষ জেনেশুনে কেন পাপ করে থাকে? : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এরূপ প্রশ্নই অর্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এই সমস্যা একা অর্জুনের নয়। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য ব্যাসদেব অর্জুনকে তো শুধুমাত্র এক নিমিত্ত বানিয়েছিলেন। সত্যকথা বলতে কি এই প্রশ্ন ও সমস্যা আমার, আপনার এবং আমাদের সকলের। কখনও না জেনে অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন পাপ হয়ে যায়, সে কথা পৃথক। কিন্তু মানুষ জেনে শুনে পাপ কেন করে থাকে? এ বিষয়ে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রশ্নগুলি হলো :

1. "অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৩৬ প্রথম লাইন)

অর্থাৎ "কিসের প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ পাপ করে থাকে?"

2. 'অনিচ্ছন্নপি' — অর্থাৎ "অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন মানুষ পাপ করে থাকে?" (৩।৩৬, ২য় লাইন)

3. 'বলাদিব নিয়োজিতঃ' (৩।৩৬, ২য় লাইন)। অর্থাৎ বলপূর্বক (যেন জোর করে) কেহ মানুষকে পাপ করিয়ে থাকে।"

উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা ভাল ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য।

'মিথ্যা বলা পাপ এবং অধর্ম'; একথা কে না জানে? তা সত্ত্বেও অনেক ব্যক্তি সারাদিনের মধ্যে বহু বার মিথ্যা কথা বলে থাকেন। 'চুরি করা পাপ এবং অধর্ম', একথা চোর ভাল ভাবেই জানে। তথাপি সে চুরি করে থাকে। 'প্রামাণিক হওয়া, সত্যকে অনুসরণ করা ধর্ম', একথা মানুষ ভাল ভাবেই জানে। তা সত্ত্বেও মানুষ অনেক বার অ-প্রামানিক (ভ্রান্ত এবং অসত্য) ব্যবহার করে থাকে। ধর্ম কাকে বলে? অধর্ম কাকে বলে?' এ বিষয়ে শাস্ত্র এবং সাধু-সন্তগণ যেন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মানুষকে বলে চলেছেন। আমরাও এসব বিষয়ে অনেক শ্রবণ করেছি এবং অবগতও আছি। তথাপি অনেক সময় ধার্মিক আচরণ ত্যাগ করে, অধার্মিক কাজে জড়িত হয়ে পড়ি। কেন এমন হয়?

দুর্যোধনের মত দুরাত্মা, দুষ্টাত্মাও মহাভারতে স্বীকার করেছেন, "জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।" অর্থাৎ "ধর্ম কি তা আমি জানি, তথাপি তাতে আমার প্রবৃত্তি হয়না।" "জানামি অধর্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ।" অর্থাৎ "অধর্ম কি তাও আমি ভাল ভাবে জানি, তথাপি তা থেকে আমি নিবৃত্ত হইনা।" কিন্তু সামান্য বিচার করে দুর্যোধন নিজেই পরে নিজের অনুভব প্রকাশ করে বলেছেন,

"কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।"

অর্থাৎ (ভাবার্থ) "কোন এক দুষ্ট ভাবনা, যেন কোন শক্তিশালী দেবতা (অথবা দানব) আমার হৃদয়ে বসে আমাকে যেমন প্রেরণা দিয়ে থাকে আমি তাই করি।"

একথা সত্য যে দুর্যোধন এক দুর্জন, অধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তথাপি তিনি এতটুকু অনুভব করতে সক্ষম ছিলেন এবং স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন, "কোন দুষ্ট শক্তি আমার মনে বসে আছে, যা আমাকে পাপকর্মে প্রেরিত করছে।"

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা অনেকেই দুর্যোধনের মত এতটুকু স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। আমরা এতই অহংকারী যে জেনে শুনে পাপ কর্ম করার পরও এরূপ প্রমাণ করতে চেষ্টা করি, "আমি যা করেছি, তা 'আমি-ই' করেছি, তাই তা পাপ নয়।" তাই এক দৃষ্টিতে আমরা দুর্যোধনের চেয়েও দুষ্ট এবং অধম বলে গণ্য হবো।

যাক্, অর্জুনের জিজ্ঞাসা তিনটি প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ যোগ্য। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৩৬)

অর্থাৎ (ভাবার্থ) "মানুষ কিসের প্রেরণায় পাপাচরণ করে থাকে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও বল পূর্বক (যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে অর্থাৎ জোর করে), পাপ কর্ম করায়। মানুষকে পাপ কর্মে প্রবৃত্ত (নিয়োজিত) করায় কে?"

কপালে কুমকুমের তিলক ধারণ করতে অনেকেই পছন্দ করেন। কিন্তু কাজলের তিলক কপালে ধারণ করতে কেউ পছন্দ করেনা। তথাপি কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুমকুমের বদলে কাজলের তিলক কপালে ধারণ হয়ে যায়। তা কেন হয়? অনেক বক্তাই ইচ্ছা করেন সত্য-বক্তা হতে, প্রামাণিক (অর্থাৎ উচ্চস্তরের) ব্যক্তি (authentic person) হিসাবে জগতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হতে। তথাপি তাঁরা কেন অসত্য বলেন এবং কেন জেনে শুনে

অপ্রামাণিকতা-পূর্ণ অন্যায় আচরণ করে পাপে পতিত হয়ে থাকেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় অর্জুনকে কৃপা করে এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৩৭, প্রথম লাইন)

অর্থাৎ (ভাবার্থ) 'রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কাম এবং ক্রোধ মানুষের চরম শত্রু। মানুষের অন্তঃকরণে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের কামনা-বাসনাই তাকে পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করায়।"

মনে করুন উজ্জ্বল লোমযুক্ত শ্বেতবর্ণের আপনার ছোট বিড়ালটিকে সুগন্ধি জলে স্নান করিয়ে ওর শরীরে দামী পফ্ পাউডার লাগিয়ে, সুন্দর একটি রেশমের বস্ত্র এবং গোলাপ ফুলের একটি মালা গলায় পরিধান করিয়ে উঁচু একটি সুন্দর আসনে মখমলের গদীতে বসালেন। তাহলে বিড়ালটি খুব বুদ্ধিমান জ্ঞানীর মত শান্তিতে বসে থাকবে। কিন্তু এমন সময় ধরুন, ছোট একটি ইঁদুর দূরে গৃহের কোণায় দৌড়ে যাচ্ছে। বিড়ালটি তা দেখা মাত্র, তৎক্ষণাৎই তার জন্মজাত স্বভাব ও বাসনার বশে উঁচু আসনের উপর থেকে লাফিয়ে ইঁদুরটিকে ধরতে যাবে। তদ্রূপ ভাবে কোন ব্যক্তি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান বা পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তার অন্তঃকরণে স্থিত কামনা-বাসনা সংযোগ পেলেই, কোন বিশেষ পদার্থ বা ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাপ কর্মে লিপ্ত হবার জন্য ছুটে যাবেন। আর সেই কামনা-বাসনা বাধা প্রাপ্ত হলে তখন তার ক্রোধ উৎপন্ন হবে। তখন সৌভাগ্যক্রমে তার পাশে যদি সতত সৎসঙ্গ দ্বারা প্রাপ্ত বিবেক এবং বৈরাগ্যের শক্তি না থাকে, তাহলে তার অধঃপতন হতে আর বিলম্ব হয়না। আর তাতে ঐ পাপের ফল-স্বরূপ সৃষ্ট দুঃখ তাকে তো অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

40. প্রতিটি কর্মই ক্রিয়া, কিন্তু প্রতিটি ক্রিয়া কর্ম নয় : ক্রিয়া এবং কর্ম এই দু'টি শব্দের মধ্যে কি পার্থক্য, তা আমাদের বোধগম্য হওয়া

আবশ্যক। আমরা সকলেই জানি যে শারীরিক ক্রিয়া দেখা যায়, কিন্তু মানসিক ক্রিয়া দেখা যায়না।

ক্রিয়া সাধারণতঃ তিন প্রকারের। যথা—

(i) শুধুমাত্র শারীরিক ক্রিয়া,

(ii) শুধুমাত্র মানসিক ক্রিয়া এবং

(iii) মানসিক এবং শারীরিক উভয়ের মিশ্র-ক্রিয়া,

(i) শুধুমাত্র শারীরিক ক্রিয়া : শারীরিক ক্রিয়া দু'প্রকারের। যথা — (ক) অনৈচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়া এবং (খ) ঐচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়া।

(ক) অনৈচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়া : এমন কিছু শারীরিক ক্রিয়া আছে যা নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তা স্বাভাবিক ভাবে হয়ে যায়। এগুলিকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, হৃদয়ের স্পন্দন হচ্ছে, শিরা-উপশিরা ও নাড়ীর মধ্যে সতত রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে, পেটে পচন ক্রিয়া চলছে, চোখের পলক খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে। ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও এসব ক্রিয়াগুলি হচ্ছে এবং হবেও। আমরা জোর করে তা বন্ধ করতে পারিনা, বন্ধ করার চেষ্টা করলে মৃত্যু হবে।

(খ) ঐচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়া : শরীরের এমন কিছু ক্রিয়া আছে যা আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে করে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আপনি আপনার হাতটি উপরে উঠালেন, পা লম্বা করলেন, পা বাঁকা করলেন, এক পায়ের উপর দাঁড়ালেন, শীর্ষাসনাদি করলেন, দৌড় বা লম্ফ প্রদান করলেন ইত্যাদি।

উপরোক্ত ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক এবং শারীরিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে যেখানে আপনার মন সংলগ্ন হয়না এবং মনের পছন্দ-অপছন্দ, রাগ বা দ্বেষ দ্বারা যুক্ত হয়না, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভাষায় তা কর্ম নয়।

(ii) শুধুমাত্র মানসিক ক্রিয়া : কোন কোন ক্রিয়া আপনি শুধু মাত্র মনের দ্বারাই করে থাকেন, শরীর দ্বারা নয়। উদাহরণ স্বরূপ আপনি মনের

দ্বারা কত রকমের বিচার-ভাবনা করে থাকেন। কখনও মন দ্বারা কারো ভাল বা মন্দ করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। এসব মানসিক ক্রিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক ক্রিয়ায় পরিণত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা শুধুমাত্র মানসিক ক্রিয়া রূপেই গণ্য হবে এবং তা কর্মের ব্যাখ্যার মধ্যে আসেনা। ক্রিয়ার মধ্যে যখন হেতু বা কারণ, বৃত্তি বা অহংকার যুক্ত হয় তখনই তা কর্ম হয়ে থাকে।

আপনি মনের দ্বারা কোন পাপ করার ইচ্ছা করলেন, কাউকে থাপ্পড় মারার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর দ্বারা আপনার হাত ঐ ব্যক্তির শরীরের উপর উঠিয়ে থাপ্পড় না মারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবেনা। তাই ফৌজদারী আইনানুসারে সরকার একটি ধারা রেখেছে, "Intention to commit an offence is not an offence."

শুধুমাত্র মানসিক ক্রিয়া দ্বারা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ গণ্য হয়না। (কোন ফৌজদারী উকিলকে তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাই বলবেন।) কলিযুগে ফৌজদারী আইনের গ্রন্থেও তা উল্লেখ রয়েছে। কলিযুগের প্রশংসা করে গোস্বামী তুলসী দাসজী রামায়ণে লিখেছেন,

"কলিযুগ কর যহ্ পুনিত প্রতাপা।
মানস পুণ্য হোই নহীঁ পাপা।।"

কলিযুগে মানসিক পূণ্য করলেও পূণ্য লাভ হয়ে থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র মানসিক পাপ করলে তাতে পাপ হয় না। তবে এর অর্থ এই নয় যে মানসিক পাপ করার বিষয়ে মানুষ পূর্ণ মুক্ত। মানসিক পাপেও দোষ অবশ্যই হয়। অর্থাৎ এর সঠিক ভাবার্থ ও তাৎপর্য্য হলো কলিযুগে মানুষ যদি ভুল ক্রমে কোন অনুচিত, মন্দ-বিচার ভাবনা করে বা মন দ্বারা কোনো পাপ করে, কিন্তু শরীর দ্বারা ঐ পাপ করার পূর্বেই যদি অন্তঃকরণ দ্বারা ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার ঐ পাপের ক্ষমা হতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা কেবল কলিযুগেই রয়েছে। সত্যযুগে তা ছিলনা,

শাস্ত্র এমনটি বলে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি জেনে শুনে মানসিক কোন পাপ করে, আর এর জন্য অনুশোচনার পরিবর্ত্তে সতত ঐ মানসিক পাপ করতেই থাকে, তাহলে এক সময় এমন আসবে যখন তার মানসিক পাপ এতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে সেই ব্যক্তির শরীরকে যেন জোর করে অর্থাৎ বল পূর্বক তাকে বিবশভাবে ঐ শারীরিক পাপ-ক্রিয়া করাবেই। আর ঐ সময় ঐ ক্রিয়া, কর্ম হয়ে যাবে। তারপর এর ফল হিসাবে ঐ ক্রিয়মাণ-কর্ম সঞ্চিত কর্মরূপে জমা হবে এবং সময় মত তা পরিপক্ক হয়ে 'পাক্কা-প্রারব্ধ' রূপে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হবেই। আর ঐ সময় হাসতে হাসতে করা পাপ কাঁদতে কাঁদতেই ভোগ করতে হবে, ভোগ না করে ঐ দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হবেনা।

(iii) মানসিক এবং শারীরিক উভয়ের মিশ্র-ক্রিয়া : মানুষের মনে অনন্ত কামনা বাসনা সূক্ষ্মে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সেই সব কামনা-বাসনা ও ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মানুষ নিজের কর্ত্তৃত্ব-অভিমান নিয়ে, রাগ বা দ্বেষের বশীভূত হয়ে শারীরিক ক্রিয়া করে থাকে। এইসব যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয়। আর এসব ক্রিয়মাণ কর্মের ফল স্বরূপ পাপ পূণ্য সৃষ্টি হয় এবং সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করতে হয়। আমরা পূর্বের বর্ণনায় লক্ষ্য করেছি যে এরূপ ক্রিয়মাণ কর্ম যদি তৎক্ষণাৎ ফল দিতে না পারে তাহলে তা কিছু সময় ধরে সঞ্চিত কর্ম রূপে পড়ে থাকে। আর সময়মত তা পরিপক্ক হয়ে প্রারব্ধরূপে কর্মফল ভোগ করার পরেই তা শান্ত হয়ে থাকে।

কোন ক্রিয়াকে ভাল বা মন্দ বলা যায় না। অর্থাৎ ক্রিয়া ভালও নয় এবং মন্দও নয়। ক্রিয়া তো ক্রিয়া মাত্রই। কিন্তু যখন কোন ক্রিয়ার সাথে মনের 'অহংকার, রাগ-দ্বেষ, কামনা-বাসনার অংশ সমর্থন দেয় তখন ঐ ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় এবং তখন ঐ কর্ম ভাল বা মন্দ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ঐ কর্ম থেকে পূণ্য বা পাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর এর ফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করার জন্য জীবকে দেহ ধারণ করতে হয় এবং

জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়তে হয়। এই বিশ্বে কর্ম-ফলের নিয়ম বা বিধান রয়েছে কিন্তু ক্রিয়া-ফলের কোন বিধান নেই। যদি কোন অবুঝ-অজ্ঞানী ছোট শিশু বা বালক অহংকার, ইচ্ছা দ্বেষের বশীভূত না হয়ে, না জেনে কোন ছোট প্রাণীকে মেরে ফেলে তাহলে তার একটি ক্রিয়া হলো, কিন্তু তাকে কর্ম বলা যাবে না। মানুষ রাগ দ্বেষের বশীভূত না হয়ে রোজ সদাই অসংখ্য জীবাণুকে মারছে, ভক্ষণ করছে। দুধ, শাক-সবজী, অন্ন, জলাশয়, শ্বাস গ্রহণ-ক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে অসংখ্য জীবাণুকে মেরেই চলছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এর পিছনে মনের কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সংযুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ক্রিয়া হবে, কর্ম হবেনা, তা হিংসা বলে গণ্য হবে না।

ক্রিয়া এবং কর্মের মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিত ছকে দেখানো যেতে পারে।
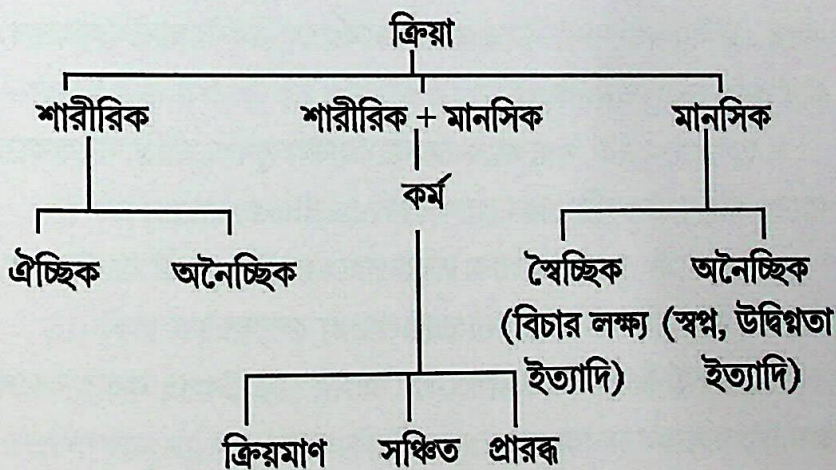
41. কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম : 'কর্ম' বিষয়ে ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১৭)

অর্থাৎ "কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের (নিষিদ্ধ কর্মের) স্বরূপ জানা আবশ্যক। কেননা কর্মের গতি গহন (জটিল/দুর্বোধ্য)।

কর্মের গতি যে দুর্বোধ্য এ বিষয়ে ভগবানের বক্তব্য এরূপ যে,

কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্মের গতি (স্বরূপ) দুর্বোধ্য। তাই এগুলির স্বরূপ জানা আবশ্যক, কর্মের স্বরূপ জানা আবশ্যক। অধিকন্তু বিকর্ম এবং অকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা উচিত। কেননা উক্ত তিন বিষয়ের স্বরূপই দুর্বোধ্য, জটিল।

এ বিষয়ে ভগবানের সত্যিকারের অভিপ্রায় (উদ্দেশ্য) কি তা স্পষ্টরূপে জানা অত্যন্ত মুশকিল (কঠিন)। আর তাই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সাধারণ ভাবে এই বিদ্বানগণ কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্মের যে 'সর্ব-সামান্য' (সাধারণ) অর্থ করেছেন তা নিম্নরূপ।

1. ইহলোকে এবং পরলোকে যে কর্মের ফল সুখ ও শান্তি দায়ক হয়ে থাকে, এরূপ উত্তম ক্রিয়ার নাম কর্ম (Prescribed action)

2. যে কর্মের ফল ইহলোক এবং পরলোকে দুঃখদায়ী হয়ে থাকে, এরূপ কর্মকে 'বিকর্ম' (Prohibited action) বলা হয়।

3. যে কর্ম করা বা কর্মত্যাগ কোন প্রকার ফল উৎপন্ন করার কারণ হয়না, এরূপ কর্মকে 'অকর্ম' (Inaction) বলা হয়।

সাধারণ ভাবে আমরা মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা হওয়া যাবতীয় ক্রিয়াকে কর্ম বলে থাকি। আর তাই কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্মের অর্থকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়ে থাকে। সেজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

"কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১৬ প্রথম লাইন)

অর্থাৎ কর্ম কি, অকর্ম কি তা বুঝতে মহান বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণও বিচলিত এবং মোহিত হয়ে যান, কেননা এগুলির স্বরূপ জটিল।”

তা থেকে এরূপ মনে হয় যে শুধুমাত্র মন, বাণী এবং শরীরের স্থূল ক্রিয়া বা অক্রিয়ার নাম কর্ম, বিকর্ম বা অকর্ম নয়, কিন্তু কর্ম-কর্ত্তার ভাবনা অনুসারে যে কোন ক্রিয়া, প্রসঙ্গ-অনুসারে কর্ম, বিকর্ম বা অকর্ম রূপে পরিণত হয়ে থাকে। এ বিষয়টি নিম্নে দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা করা হলো।

1. কর্ম (Prescribed action) : সাধারণ নিয়ম অনুসারে মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা হওয়া শাস্ত্র বিহিত এবং উত্তম ক্রিয়াকেই কর্ম (Presribed action) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বিহিত কর্ম বিধি-পূর্বক করা সত্ত্বেও কর্ম কর্ত্তার অনুচিত ভাবনার জন্য সেই কর্ম কখনও অশুভ কর্ম হয়ে থাকে। অর্থাৎ কর্ম কর্ত্তার ভাবনার আধারের উপর কর্ম নির্ভরশীল। অশুভ ভাবনার জন্য কখনও কর্ম পরিবর্তিত হয়ে বিকর্ম বা অকর্ম হয়ে যায়।

কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম সম্বন্ধে বলা যায় যে,

(i) কর্ম ফলের শুভ ইচ্ছা নিয়ে, শুদ্ধ ভাবনা সহ, শাস্ত্র বিহিত যে কোন উত্তম কর্মই সত্যিকার অর্থে কর্ম।

(ii) কিন্তু কর্ম ফলের অশুভ ইচ্ছা নিয়ে ধার্মিক ক্রিয়া যথা—যজ্ঞ, তপস্যা, দান, সেবা ইত্যাদি কর্ম যদি কোন নিন্দনীয় বা নিকৃষ্ট ভাবনায় প্রজা বা অন্য ব্যক্তির কোন অনিষ্ট করার জন্য করা হয়, তাহলে সেই কর্ম তমোগুণ প্রধান হওয়ায় তা বিকর্ম (Prohibited action) বলেই গণ্য হবে। (iii) আর কোন কর্ম যদি কর্ত্তৃত্ব অভিমান এবং ভোক্তৃত্ব-ভাবনা (যথা—এর ফল আমি ভোগ করব এরূপ ভাবনা) ত্যাগ করে করা যায়, কোন রাগ দ্বেষ বিনা, সমষ্টি কল্যাণের জন্য বা ভগবদ্ প্রীত্যর্থে করা যায়, তাহলে সেই কর্ম ‘অকর্ম’ (Inaction) বলেই গণ্য হবে।

2. বিকর্ম ***Prohibited action/নিষিদ্ধ কার্য*** **:** সাধারণতঃ মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা হওয়া হিংসা, অসত্য, চুরি ইত্যাদি গর্হিত বা নিষিদ্ধ কর্মকেই 'বিকর্ম' বলা হয়।

কিন্তু কখনও এরূপ বিকর্মও কর্ম-কর্ত্তার ভিন্ন ভাবনা অনুসারে অকর্মে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, আবার অকর্মও কর্মে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। নিম্নে উদাহরণ সহ বিষয়টিকে বর্ণনা করা হলো।

(i) ইহলোকে বা পরলোকে কোন শুভ ফল লাভের ইচ্ছায়, সঠিক, সত্য ভাবনা নিয়ে, শুদ্ধভাবে কোন ধার্মিক ক্রিয়া করলে তা বিকর্ম না হয়ে কর্ম হবে।

কিন্তু বিশেষ কোন কারণে অথবা বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারে বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ-কর্ম, কর্ম হয়ে যায়। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত গ্রন্থাদিতে এর উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলার প্রেরণা (Abetment) দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনের হস্তে নিজ গুরু দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্ম পিতামহের নিহত হওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি জাগতিক দৃষ্টিতে বিকর্ম হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে তা বিকর্ম নয়, কর্ম রূপেই গণ্য হয়ে থাকে।

(ii) কর্ত্তৃত্বাভিমান বিনা, রাগ দ্বেষ রহিত হয়ে, সমষ্টি কল্যাণের জন্য কোন ক্রিয়া করা হলে জাগতিক দৃষ্টিতে তা বিকর্ম মনে হলেও তা অকর্ম রূপে পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। যথা—মহাভারতের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করার প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণের ছিল। কিন্তু পরম ভক্ত ভীষ্ম পিতামহের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, রথের চক্র অস্ত্ররূপে ধারণ করেছিলেন। কর্ত্তৃত্বাভিমান বিনা, সমষ্টি কল্যাণের জন্য তা করা হয়েছিল বলে ঐ ক্রিয়া বিকর্ম ছিল না। বরং তা অকর্ম (Inaction) রূপেই গণ্য হয়ে থাকে।

3. অকর্ম (Inaction/in active action নিষ্ফল কার্য) : মন, বাণী এবং শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়াকেই অকর্ম বলা যাবে, এমন নয়। বাস্তব সত্য কথা হলো যে মন বাণী ও শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা যায়না।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৫, প্রথম লাইন)

অর্থাৎ "কোন মানুষ এক মুহূর্তের জন্যও কর্ম না করে (ক্রিয়াহীন হয়ে) থাকতে পারে না।"

"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৮।১১, প্রথম লাইন)

অর্থাৎ "দেহ ধারণ করে কোন মানুষ বা প্রাণীর পক্ষে সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা সম্ভব নয়।" তাই নিম্ন লিখিত কর্মগুলিকে অকর্ম (Inaction) বলা যেতে পারে।

1. কর্ত্তৃত্বাভিমান বিনা করা কর্ম।
2. রাগ দ্বেষ শূন্য কর্ম।
3. পবিত্রতা ও শুদ্ধাশুদ্ধির সাথে, কর্ত্তব্যবোধে করা নিত্য কর্ম।
4. 'আমার ভগবান প্রসন্ন হোন' এরূপ ভাবনায় ভগবদ্ প্রীত্যর্থে করা কর্ম।
5. সমষ্টি কল্যাণের জন্য করা কর্ম।
6. 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' (ফল সমর্পণ) করে করা কর্ম।
7. নিষ্কাম কর্ম।

উপরোক্ত কর্মগুলি অকর্ম রূপে গণ্য হলেও কর্ম কর্ত্তার মনের ভাবনা পরিবর্ত্তনের জন্য কখনও কখনও কর্মও বিকর্ম রূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে। যথা—

1. হয়ত কোন সাধক মন, বাণী এবং শরীরের যাবতীয় ক্রিয়াগুলিকে বন্ধ করে (ত্যাগ করে) কোন একান্ত স্থানে ক্রিয়ারহিত অবস্থায় বসে গেলেন, কিন্তু তার ভিতরে কর্ত্তাভিমান রূপ অহংকার ত্যাগ করা হয়নি। 'আমি কর্ম ত্যাগ করেছি', কর্ম ত্যাগের এরূপ অহংকার তার মধ্যে থাকলে 'ত্যাগ রূপ ক্রিয়া' কর্ম রূপে পরিণত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ত্যাগরূপ ক্রিয়ার অহংকারই কর্ম হয়ে যাবে।

2. কোন ব্যক্তি কিছু দায়িত্ব-কর্ত্তব্য গ্রহণ করে যদি তিনি ভয় অথবা কোন স্বার্থ লাভের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে সেই দায়িত্ব পালন না করে দায়িত্ব পালন করা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেকে কর্ত্তব্য পালন করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, অথবা কোন প্রকার মন্দ উদ্দেশ্যে অন্যান্য মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেও সেই কর্মকে বাহ্য ভাবে ত্যাগ করেন তাহলে তা বিকর্মের দুঃখ রূপ ফল উৎপন্ন করবে। তখন তার সেই 'অকর্ম' বিকর্ম রূপে পরিণত হয়ে যাবে।

উপরোক্ত বর্ণনায় এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মকে নির্ণয় শুধুমাত্র বাহ্য ক্রিয়া অথবা নিষ্ক্রিয়শীলতা দ্বারা করা সম্ভব নয়। কর্মকর্ত্তার হৃদয়ের ভাবনা বা কর্মের উদ্দেশ্য ও হেতুকে বিচার করে, তার ক্রিয়া, কর্ম, অকর্ম অথবা বিকর্ম কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কী জন্য, কী ভাবনা ও কী উদ্দেশ্য নিয়ে এরূপ ক্রিয়া করা হয়েছে, তা জানবার পরেই এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় নিতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোকগুলিতে কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম শব্দ ভগবান প্রয়োগ করেছেন, এগুলির সহজ, সরল অর্থ এরূপ হতে পারে যে কর্ম মানে সৎ-কর্ম, ভাল কর্ম এবং পূণ্যকর্ম। আর বিকর্ম মানে মন্দ কর্ম এবং পাপকর্ম।

পূণ্যকর্ম ও সৎকর্মের পায়ে সুখরূপী ফল আর বিকর্ম অর্থাৎ পাপ কর্মের পায়ে দুঃখরূপী ফল লেগে থাকে। এটা সত্য যে সুখভোগ হোক

অথবা দুঃখ ভোগই হোক, এর জন্য শরীর ধারণতো করতেই হবে, দেহের বন্ধনে আসতেই হবে। তবে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সৎ-কর্ম যেন স্বর্ণের শিকল, আর বিকর্ম (অর্থাৎ পাপকর্ম) যেন লোহার শিকল। দুই-ই জীবাত্মাকে দেহরূপ কারাগারে শিকলের বন্ধনে বেঁধে রাখে। এর ফলে জীবাত্মা বন্ধন থেকে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতে পারে না।

আর 'অকর্ম' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেন এক অলৌকিক বিষয়। কোন ক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও সেই ক্রিয়াতে কর্ত্তৃত্ববোধ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি না থাকলে, ঈশ্বর প্রীত্যর্থে অথবা সমষ্টি কল্যাণের জন্য করা হলে তা অকর্ম (inaction) রূপে গণ্য হবে। এর ফল সঞ্চিত কর্ম রূপে জমা হয়না। আর তাই এর জন্য প্রারব্ধ অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ফলের দ্বারা জীবকে বন্ধন দশায় পতিত হতে হয়না। সুতরাং অকর্ম মোক্ষলাভের জন্য সহায়ক হয়। তা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির পরম সাধনা বলে গণ্য হয়ে থাকে।

তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপর একটি সুন্দর কথা বলেছেন,

"কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্কর্মনি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১৮)

অর্থাৎ (ভাবার্থ) যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখেন অর্থাৎ অহংকার রহিত কর্মকে কর্ম না হওয়াই মনে করেন, আর অজ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা শুধু মাত্র ক্রিয়া ত্যাগ করাকে কর্মই দেখেন, সেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং যোগযুক্ত ব্যক্তি।

'ভোলা' নামে জনৈক হিন্দিভাষী কবি উপরোক্ত শ্লোকটির ভাবার্থ করে লিখেছেন,

"দেখে কর্ম অকর্মমে, কর্মনমাঁহি অকর্ম,
পণ্ডিত যোগী শ্রেষ্ঠতম, করত সর্ব হী কর্মঃ
করত সর্ব হী কর্ম, কর্ম সে লিপ্ত ন হোবে,
জানত কর্ম-অকর্ম শান্ত মন সুখ সে সোবে,

করে দেহ সে কর্ম আপকো নিষ্ক্রিয় দেখে,
ভোলা শান্তি সোয়, আপ মে সব কে দেখে।"

কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখার অর্থ কী? আর অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখার অর্থ কী? এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'কর্মে অকর্ম দেখো' কথাটি যেন উল্টো কথা বলে মনে হচ্ছে। আসলে কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখার অর্থ হলো : বাহ্যরূপে স্বয়ং কর্মের কর্ত্তা হওয়া সত্ত্বেও "আমি বস্তুতঃ কর্মের কর্ত্তা নই", এরূপ দৃঢ় ভাবনা রাখা। এরূপ দৃঢ় ভাবনা কখন সৃষ্টি হতে পারে? কর্ম করার সময় স্বয়ং সাক্ষী ভাবে, দ্রষ্টা ভাবে স্থিত থাকার স্থিতি লাভ করলে এরূপ দৃঢ় ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মনে করুন আপনি আহার করছেন। আর আহার করার সময় আপনি দৃঢ় ভাবনা রাখছেন, "বস্তুতঃ আমি আহার করছিনা, শুধু সাক্ষী ভাবে তা দেখছি মাত্র। দেখছি যে একটি শরীরের ক্ষুধা লেগেছিল এখন ভোজন করছে। আমি তো কেবল সাক্ষী স্বরূপ; দ্রষ্টা স্বরূপ হয়ে ভোজন ক্রিয়া দেখছি।" তা সত্য যে এরূপ স্থিতি লাভ করা খুব কঠিন। দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা তা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে সদা আত্ম সচেতন থাকা আবশ্যক। ভগবানের সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে তা স্বয়ং তিনিই করছেন। এ বিষয়ে আমাদের অহং-কর্ত্তৃত্বভাব পরিত্যাগ করা উচিত।

স্বামী রামতীর্থ মহারাজ একবার আমেরিকায় কোন একটি রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাস্তার কিছু লোক তাঁকে গালি দিতে শুরু করে এবং তাঁকে লক্ষ্য করে হাসিঠাট্টা শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে স্বামী রামতীর্থ মহারাজ যে গৃহে অবস্থান করছিলেন সেখানে পৌছলেন। সেখানে তিনি খুব আনন্দের সাথে উচ্চ-হাস্য করছিলেন। গৃহের লোকজন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্বামীজী বললেন, "বিনা কারণে হাসছিনা। আজ আমি যখন রাস্তায় হেঁটে চলছিলাম তখন হাসির একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমি যখন হাঁটছিলাম, তখন দেখলাম রামের

সঙ্গে কিছু লোকের সাক্ষাৎ হলো। তারপর লোকগুলি রামকে গালি দিতে শুরু করলো, রামকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলো।" স্বামীজীর ঐ ভাব-ভাষা গৃহের লোকজনের বোধগম্য না হওয়ায় তাঁরা আশ্চর্য হলেন। স্বামীজী দাঁড়িয়ে পুনঃ ঐ কথা বলতে লাগলেন। তিনি আরও বললেন, "মানুষগুলি রামকে যখন গালি দিচ্ছিল এবং বিদ্রূপ করছিল তখন রাম প্রথমে সামান্য সময়ের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। আমি একই সঙ্গে সাক্ষীভাবে রামের ঐ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা দেখছিলাম এবং ঐ লোকগুলি যে রামকে গালি দিচ্ছিল ঐ দৃশ্যও দেখছিলাম।"

গৃহের লোকগুলি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি নেশাগ্রস্ত হয়ে এসব কথা বলছেন?" তখন স্বামীজী বললেন, "আপনারা সবাই নেশাগ্রস্ত, আমি নেশাগ্রস্ত নই, আত্ম-সচেতন অবস্থায় রয়েছি বলেই তো একথা বলছি। যদি নেশাগ্রস্ত হতাম তাহলে আমি মনে করতাম ঐ লোকগুলি আমাকে গালি দিচ্ছিল, বিদ্রূপ করছিল। কিন্তু আমি পূর্ণ আত্ম-সচেতন ছিলাম বলেই বোধ করতে পারছিলাম যে আমাকে নয়, শ্রীরামকেই গালি দিচ্ছিল, আমি নির্বিকার, দ্রষ্টা ও সাক্ষীভাবে তা দেখছিলাম মাত্র। শ্রীরাম এবং আমি পৃথক নই।"

এরূপ সাক্ষী ও দ্রষ্টাভাবে স্থিত হলে কর্ম তখন অকর্ম হয়ে যায়।

আপনি যখন ভোজন করছেন তখন দৃঢ়ভাবে ভাবনা করুন, "শ্রীরাম ভোজন করছেন।" এরূপ সাক্ষী-ভাব রাখতে চেষ্টা করুন। দৃঢ় ভাবনা করুন, "শ্রীরামের ক্ষুধা পেয়েছে, নিদ্রা পেয়েছে, আপনি শুধুমাত্র সাক্ষীরূপে দেখছেন। এরূপ দেখার কলা-কৌশলই কর্মকে একদিন অকর্মে পরিণত করে দিবে। তখন মানুষ কর্ম করেও অকর্ত্তা হয়ে থাকেন।

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর চেয়েও কঠিন একটি কথা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বললেন। তাহলো "অকর্মে কর্ম দেখা।" "পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ" শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১৮ অর্থাৎ ভগবান প্রথমে বলেছেন, "কর্মে অকর্ম

দেখা।” এখন বলছেন, “অকর্মে কর্ম দেখা। যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনি যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ। জ্ঞানী ব্যক্তি অকর্মে কর্ম দেখেন। অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তির ক্রিয়া-ত্যাগ করাকে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্মই দেখেন। কর্ত্তা-ভাব নিয়ে কিছু না করা, বস্তুতঃ কিছু করাই। কেননা এক্ষেত্রে কর্ত্তাবোধ রয়েছে। দ্রষ্টা ও সাক্ষীভাবে, কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত ক্রিয়া অকর্ম বলে গণ্য হয়। এ বিষয়টির স্পষ্ট ধারণা করা একটু কঠিন। কর্ত্তৃত্বভাবে ক্রিয়া, দ্রষ্টা বা সাক্ষীভাব শূন্য হয়ে ক্রিয়া বস্তুতঃ কর্মই।

বাস্তবিক এটা লক্ষণীয় বিষয় যে প্রথম অংশের কথা সাক্ষী ও দ্রষ্টা ভাবে অবস্থান করার স্থিতি লাভ হলে তবেই দ্বিতীয় অংশের স্থিতি লাভ হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় স্থিতিতে সমগ্র সংসার চক্রের চালক পরমাত্মার সাথে একাত্ম, তাদাত্ম্য হবার স্থিতি, তা অনুভবের বিষয়। আর এই স্থিতি সম্যক রূপে লাভ হলে, অনুভব হলে তখন পরমাত্মার যাবতীয় শক্তি নিজের শক্তি বলেই অনুভব হয়। সেই স্থিতিতে সৃষ্টির ‘যখন যা কিছু হচ্ছে তা একমাত্র স্বয়ং ভগবানই করছেন’ এটা অনুভব হয়। তখন ভগবান থেকে দ্বিতীয় কোন পৃথকবোধ আর সাধকের থাকেনা, তিনি ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ তাদাত্ম্য ও একাত্ম হয়ে অবস্থান করেন।

স্বামী রামতীর্থ মহারাজ একবার খুব আনন্দের সঙ্গে বলছিলেন, “দেখো, এই সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদি সবাইকে প্রথম আমিই গতি প্রদান করেছি, তাঁদেরকে গতিমাণ করেছি, চলন-শক্তি প্রদান করেছি এবং আমিই এই সবকে সদা গতিমান রাখছি। আমি সর্বপ্রথম চন্দ্র তারকাকে ইশারা (সংকেত) করে গতিমাণ করে দিয়েছি।”

কিছুলোক স্বামীজীকে বলেছিলেন, “আপনি করেছেন? বিশ্বাস ও ভরসা হচ্ছে না। স্বামীজী তখন বলেছিলেন, “হাঁ, আমি অর্থাৎ রামতীর্থ। তবে এই শরীরধারী রামতীর্থ নয়। কিন্তু তা থেকে পৃথক যে শুদ্ধ আমি, সেই চেতনা ও শুদ্ধ অহংকার।”

এমনিভাবে শরীরের মধ্যে যিনি সাক্ষীরূপে অবস্থান করছেন তিনি যখন দ্রষ্টারূপে প্রকাশিত হন, তিনি তখন সর্বশক্তিমান পরমাত্মার সাথে একাত্ম হয়ে যান। আর সেই স্থিতিতে তিনি কিছু না করেও (কিছুতে আসক্ত বা লিপ্ত না হয়েও), সব কিছু করেন, সাক্ষী-স্বরূপে অবস্থান করে। এরই নাম হলো অকর্মে কর্ম দেখা। বাহ্য-দৃষ্টিতে তিনি হয়ত কর্মহীন হয়ে বসে আছেন, এরূপ মনে হলেও, বস্তুতঃ তিনি সবকিছু করেন। তিনিই বায়ুকে সঞ্চালন করছেন, বৃক্ষকে বৃদ্ধি করছেন, পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করছেন। তখন তিনি কোন বৃক্ষের নীচে চক্ষু বন্ধ করে বসে থাকলেও চন্দ্র-তারকা, সূর্য সবাইকে গতিমাণ করছেন।

"স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু, স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।"
(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১৮, দ্বিতীয় লাইন)

অর্থাৎ "এরূপ ব্যক্তিই সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং যোগযুক্ত (অর্থাৎ যোগী)। তিনিই সম্পূর্ণ কর্ম করতে সক্ষম (কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ)। তাঁর সেই কর্ম 'সহজ-স্বাভাবিক কর্ম'। এরূপ সহজ-স্বাভাবিক কর্মকে বাস্তবিক 'অকর্ম' বলা হয়।

কোটি কোটি বালতি দ্বারা ধৌত করেও যে গাঢ় অন্ধকারকে দূর করা সম্ভব নয়, সূর্য-নারায়ণ উদিত হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তা দূর হয়ে যায়। যদি আপনি বলেন, "হে সূর্য নারায়ণ, ভয়ঙ্কর, প্রগাঢ় অন্ধকারকে আপনি দূর করে দিয়েছেন বলে আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।" তাহলে হয়ত সূর্য-নারায়ণ এরূপ বলবেন, "আমি অন্ধকার দূর করিনি। কিন্তু আমার অস্তিত্ব, উপস্থিতি মাত্রই অন্ধকার সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে দূর হয়ে গেছে। যদি তা না হতো তাহলে আমার অস্তিত্বের কোন অর্থই হতোনা, আমার নাম আর সূর্য-নারায়ণ থাকতো না।" কর্মে অকর্ম দেখা এবং অকর্মে কর্ম দেখার এটি প্রকৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ভয়ঙ্কর প্রগাঢ় অন্ধকারকে দূর করার পরেও সূর্য নারায়ণ যেন কিছুই করেননি, তাঁর কোন কর্তৃত্বাভিমান নেই। তিনি কিছুই করেননা, কিন্তু বস্তুত প্রগাঢ় ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে তৎক্ষণাৎ

দূর করে থাকেন।

লাটিম খেলায় (ছোট বাচ্চাদের এক প্রকার খেলায়) লাটিমটি যখন সর্বোচ্চ গতিতে (highest Velocity তে) এক স্থানে ঘুরতে থাকে তখন দেখা যায় উহা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখার তা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন যন্ত্রের চাকা যখন প্রচন্ড গতিতে চলতে শুরু করে তখনও মনে হয় চাকাটি যেন স্থির হয়ে আছে, ঘুরছেনা।

আলোর প্রকাশ এবং অন্ধকার দূর করা সূর্যের সহজ-স্বাভাবিক-স্বধর্ম। প্রাতঃকালে মোরগ-পাখি ডাকে, তা তার সহজ-স্বভাব-কর্ম। এর জন্য কেহ তাকে মানপত্র (অভিনন্দন পত্র) দেয়না। কিচির মিচির করে ডাকা পাখির সহজ-স্বভাব-ধর্ম। মাকে স্মরণ করা শিশুর সহজ-স্বভাব-ধর্ম। ঈশ্বরকে স্মরণ করা সাধু-সন্তদের সহজ ধর্ম।

সমষ্টি কল্যাণের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য ভগবদ্ প্রীত্যর্থে, রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে, স্বাভাবিক ভাবে যাবতীয় কর্ম করা সাধু-সন্তগণের সহজ কর্ম। এছাড়াও অনেক কর্ম এবং অকর্ম তাঁদের জন্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট করা আছে।

সেবা-কর্ম জ্ঞানীদের সহজ কর্ম। তাদের স্বভাবই হলো অপরের উপকার করা। "আমি অন্যের উপকার করতে পারবো না।" মুখে তাঁরা এরূপ কথা কখনও বললেও বস্তুতঃ তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ নীতি সঙ্গত ভাবে অপরের উপকার করা তাঁদের সহজ স্বভাব ধর্ম। সন্ন্যাস পরম-স্থিতি, ধন্য অকর্ম-স্থিতিতে সন্ন্যাস জীবন।

বসে থাকাও এক প্রকারের ক্রিয়া। কর্ম না করাও কর্মের এক প্রকার ক্রিয়া। 'বসা' একটি ক্রিয়াপদ। শুধুমাত্র ব্যাকরণের দৃষ্টিতেই তা সত্য, এমন নয়। সৃষ্টি শাস্ত্রেও 'বসা'-কে ক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়। সূর্য নারায়ণ চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করেই চলছেন, অথচ তিনি কোন কিছুতেও লিপ্ত না হয়ে, যেন কর্মের কিঞ্চিৎ আচরণ করছেননা।

সূর্যনারায়ণ কর্ম করেও কর্ম করেননা (অর্থাৎ কর্মে লিপ্ত হননা), তা বর্ণনা করা হলো। আবার এই বিষয়টিকে অন্য এক দৃষ্টকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে। সূর্য নারায়ণ যেন কিছুই, কোন কর্মই করেননা বটে, তথাপি দুনিয়ার জন্য অনেক কাজ করে চলছেন। এটা তার অপর এক বিশেষ শক্তি। তাঁর মধ্যে অসীম প্রেরণা শক্তি রয়েছে। অকর্মের এটাই বৈচিত্রতা। অনন্ত কার্য করার জন্য আবশ্যক শক্তি অকর্মের মধ্যে পরিপূর্ণ ও নিহিত রয়েছে।

জলীয় বাষ্পকে বন্ধ করে রেখে এক প্রচন্ড শক্তি অনেক বড় কাজে উপযোগ হতে পারে। বন্ধ করে রাখা জলীয় বাষ্পের মধ্যে অনন্ত শক্তি পুঞ্জীভূত থাকে যা রেল গাড়ীর বড় বড় কামরা গুলিকে সহজেই টেনে নিয়ে যায়।

এমনি ভাবে কর্ম এবং অকর্ম দুই'ই অসামান্য বিষয়। এক দৃষ্টিতে কর্ম হলো উন্মুক্ত, খোলা বিষয়, আর অকর্ম অবস্থায় কর্ম গুপ্ত থাকে। আবার অন্য দৃষ্টিতে অকর্ম অবস্থা উন্মুক্ত বা খোলা দেখা যায়, কিন্তু অকর্মের কারণে অনন্ত কর্মের ব্যবহার চলে। এই অবস্থায় অকর্মে যেন কর্ম পরিপূর্ণ থাকে, এর সহায়তায় অনেক মহান এবং বড় কার্য করা সম্ভব হয়। এরূপ স্বাভাবিক স্থিতি বা অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন সেই মহাপুরুষের ক্রিয়া এবং একজন অলস ব্যক্তির ক্রিয়ার মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সূর্যনারায়ণ স্বয়ং সোরগোল বা হুঙ্কার করেন না। কিন্তু তাঁকে দেখতেই পাখীরা উড়তে শুরু করে, কৃষক ক্ষেতের কাজে গমন করেন এবং জগতে বিভিন্ন রকমের ব্যবহারিক কাজ-কর্ম শুরু হয়ে যায়। সূর্যের শুধুমাত্র উপস্থিতি, এতটুকুই যথেষ্ট। তাতেই অনন্ত কর্ম শুরু হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই অকর্ম অবস্থায় সূর্য নারায়ণ অনন্ত কর্মের প্রেরণা দেন।

42. কর্ম এবং অকর্মের বিষয়ে জ্ঞানী (বুদ্ধিমান) ব্যক্তিও দ্বিধাগ্রস্ত (মোহিত) হয়ে পড়েন : ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় স্বীকার করে বলেন,

"কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১৬, প্রথম লাইন)

অর্থাৎ "কর্ম কি এবং অকর্ম কি এবিষয়ে কবি (অর্থাৎ বুদ্ধিমান) ব্যক্তিগণও মোহিত হয়ে পড়েন," তাঁরাও তা সঠিক রূপে নির্ণয় করতে পারেন না। এই কথাটি বাহ্যভাবে বিচার করলে তা বিচিত্র বলেই মনে হয়। কেননা কর্ম কি, অকর্ম কি, সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন নিরক্ষর ব্যক্তিগণও তা বুঝতে পারেন।

কর্ম কাকে বলে এবং কর্ম কাকে বলেনা, তা আমরা সাধারণ জীব সবাই অবগত আছি। তথাপি ভগবান এরূপ বলছেন যে বুদ্ধিমান বা পণ্ডিত ব্যক্তিগণও কর্ম এবং অকর্মের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতে পারেননা। সুতরাং ভগবানের বাণীর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অর্থ নিহিত রয়েছে, তা আমাদের জানতে হবে। এমনটি হতে পারে যে আমরা যাকে কর্ম বলে থাকি, তা হয়ত ভগবানের কাছে কর্ম বলে গণ্য নয়। আর আমরা যাকে অকর্ম বলে মনে করি তা হয়ত ভগবানের কাছে অকর্ম নয়। আসলে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভাষা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমাদের জীবনই বিচিত্র বলে এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমরা যাকে কর্ম বলে থাকি বস্তুতঃ তা কর্ম (action) নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রতিকর্ম (Reaction)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে হয়ত কেউ আমাকে গালি দিল, তখন আমিও তাকে গালি দিলাম। এক্ষেত্রে তা আমার কর্ম (action) নয়, কিন্তু তাকে প্রতিকর্ম (reaction) বলা হবে। কেউ আমাকে খুব সম্মান প্রদর্শন করলেন, মালা পরিধান করালেন এবং প্রশংসা করলেন। তাতে আমি আনন্দিত হলাম। এই যে আনন্দিত হলাম, তা আমার কর্ম (action) নয়, কিন্তু তাকে প্রতিকর্ম (reaction) বলা হবে।

বস্তুতঃ জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা কর্ম না করে প্রতিকর্মই (reaction) করে থাকি। এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক কর্মই আমাদের ভিতর থেকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে স্ফূরণ (spontaneous) হয়না বরং তা বাইরের কোন শক্তি দ্বারা প্রেরিত হয়ে তা ঘটে থাকে।

কেউ আমাকে ধাক্কা দিল, তাতে আমার মধ্যে ক্রোধ উৎপন্ন হলো। কেউ আমাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন, তাতে আমার মধ্যে আত্ম-অভিমান জাগ্রত হলো। কেউ আমাকে গালি দিল, আর আমি ক্রোধিত হয়ে তাকেও গালি দিলাম। কেউ আমাকে প্রেমপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করে সম্বোধন করলেন, আর আমি তাতে আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে গেলাম, এসব আমার প্রতিকর্ম (reaction), কর্ম নয়।

সূক্ষ্মঃ দৃষ্টি দ্বারা দেখলে বলা যেতে পারে যে কেউ হয়ত আমাকে গালি দিল, আর আমি তাকেও গালি দিতে বাধ্য হলাম। এক্ষেত্রে কেউ গালি দিল, ইহা কর্ম। আর আমি তাকে গালি দিতে বাধ্য হলাম, ইহাকে প্রতি-কর্ম বলা হবে। কিন্তু কেউ আপনাকে গালি বা ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও আপনি তা উপেক্ষা করলেন এবং তাকে গালি বা ধাক্কা দিলেননা, তাহলে এক্ষেত্রে উপেক্ষা করা এবং ধাক্কা না দেওয়ার ক্রিয়াকে বাস্তবিক 'কর্ম' বলে ধরা হবে। তদ্রূপ ভাবে, কেউ আপনাকে সম্মান না করা সত্ত্বেও যদি আপনি তাঁর প্রশংসা করেন, তাঁকে সম্মান করেন, তাহলে তা কর্ম বলে গণ্য হবে। কেউ আপনাকে প্রেমপূর্ণ শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করলেও আপনি যদি তাঁর প্রতি প্রেমভাবে গদ্‌গদ্ হয়ে যান, তাহলে সত্যিকার অর্থে তা আপনার কর্ম বলে গণ্য হবে।

সত্যিকার অর্থে 'কর্ম' মানে সহজ স্বাভাবিক ভাবে, স্বেচ্ছায় (spontaneous), স্বধর্ম মনে করে কর্ম করা, নিয়ত এবং শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া (Prescribed action) করা। যা শুদ্ধ-বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধির

স্ফূরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত (inspired) হয়ে করা হয় তা কর্ম। পক্ষান্তরে, যখন প্রতিকর্ম (reaction) বলা হয়, তখন বাইরের কোন বল দ্বারা সম্মুখে চালিত হয়ে (Propelled), বিবশ (Compelled) হয়ে করা ক্রিয়াকে বুঝায়।

আমি ভগবান বুদ্ধের সম্বন্ধে একটি বিশেষ কাহিনী পড়েছিলাম, তা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

এক ব্যক্তি ভগবান বুদ্ধের শরীরের উপর থুথু ফেলেছিল। বুদ্ধদেব সহজভাবে নিজের চাদর দ্বারা ঐ থুথুকে মুছে নিলেন, তাঁর মনে সামান্য ক্রোধ উৎপন্ন হয়নি। তিনি স্বাভাবিক ভাবে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু বলবেন না?"

তখন লোকটি একেবারে বিচলিত হলো, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো, কী জবাব দিবে তা ভেবে পাচ্ছিলনা। লোকটি ভেবেছিল বুদ্ধদেব হয়ত কিছু প্রতিকর্ম (reaction) হিসাবে ক্রোধ করবেন, হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, কেন থুথু ফেলেছো?" এসব আশা নিয়ে লোকটি পূর্বেই নিজের উত্তর প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এমন কোন পরিস্থিতিই সৃষ্টি হলোনা বলে লোকটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। আর তাই তখন সে বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কেন এমন কথা জিজ্ঞাসা করছেন?"

বুদ্ধদেব বললেন, "হাঁ, আমি ঠিকই জিজ্ঞাসা করছি। আপনি আর কিছু বলবেন কী?" লোকটি বললো, "আমি আপনাকে তো কিছুই বলিনি, কেবল আপনার উপর থুথু ফেলেছি।"

বুদ্ধদেব বললেন, "আপনি থুথু ফেলেছেন, আমি বুঝি নিয়েছি যে আপনি কিছু বলেছেন। কেননা এরূপ ভাবে থুথু ফেলা, এটাও কিছু বলার একটি উপায়। হয়ত আপনার মনে এতটা ক্রোধ ভরা ছিল যে তা শব্দ দ্বারা বলতে পারেননি, থুথু ফেলে বলেছেন, প্রকাশ করেছেন। আপনার ক্রোধ এতটুকু চরম সীমায় পৌঁছেছিল যে তা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব

ছিলনা। আমি কখনও কখনও অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত না করে ইশারা দ্বারা ব্যক্ত করে থাকি, তা করতে হয়। আপনিও আপনার ভয়ঙ্কর ক্রোধ, শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতে পারেননি বলে তা থুথু ফেলে ইশারা দ্বারা বলেছেন। সে কথা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি।"

লোকটি বললো, "আপনি কিছুই বুঝেননি। আমি তো শুধু মাত্র ক্রোধ করেছি।" বুদ্ধদেব বললেন, "হাঁ, আমি ঠিকই বুঝেছি যে আপনি ক্রোধ করেছেন।" লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, "তাহলে আপনি কেন ক্রোধ করেননি?" বুদ্ধদেব বললেন, "আপনি আমার প্রভু নন। আপনি ক্রোধ করেছেন, তাই আমিও যদি ক্রোধ করি তাহলে তো আমি আপনার দাস বলে পরিগণিত হবো। আমি আপনার পিছনে গমনকারী আপনার ছায়া নই। আপনি ক্রোধ করেছেন, বলার প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত হয়ে গেল। এখন আমাকে যা করার তা আমি করবো।" কিন্তু বুদ্ধদেব কিছু করেননি। কোনরূপ ক্রোধ না করে, থুথুকে মুছে নিয়েছিলেন। লোকটি তখন চলে গেল।

পরদিন লোকটি আবার এলো। এসেই বুদ্ধদেবের চরণে মস্তক রেখে অশ্রু বর্ষণ করে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো। তারপর মস্তক উঠিয়ে বুদ্ধদেবের দিকে তাকালে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আরও কিছু বলবেন কী?" লোকটি বললো, "আপনি কী বলছেন?"

বুদ্ধদেব বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার মনের ভাবনা এতটা গভীর হয়ে উঠেছে যে তা শব্দ দ্বারা আপনি বলতে পারছেন না, অশ্রু বর্ষণ করে আপনার মস্তক আমার পায়ের উপর রেখে, ইশারা দ্বারা সেই ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। গতকালও আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তবে তা শব্দ দ্বারা বলতে পারেননি, শুধুমাত্র থুথু ফেলে ইশারা দ্বারা বলতে চেয়েছিলেন, শব্দ দ্বারা বলতে পারছিলেন না। সে কারণে অশ্রু বর্ষণ করে, মস্তক পায়ে রেখে ইশারা (gestures) দ্বারা বলেছেন, তা

আমি বুঝতে পারছি।”

ঐ লোকটি বললো, “আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। বুদ্ধদেব বললেন, “আমি কেন ক্ষমা করবো ? আমি গতকাল আপনার উপর ক্রোধ করিনি। তাই ক্ষমা করার প্রশ্নই উঠেনা। গতকাল থুথু ফেলেছেন, এমনি ভাবে আজ আমার পায়ে পড়েছেন। ব্যস, এই ‘প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত হয়ে গেল। এর চেয়ে অধিক কর্মে জড়িত হওয়া আমার কী প্রয়োজন ? আমি আপনার দাস নই যে আপনি যখন বলবেন তখন আমি ক্রোধ করবো, আবার আপনি বললে তখন ক্ষমা করবো।”

বস্তুতঃ প্রতিকর্ম (reaction) মানে এক প্রকারের গোলামী করা, তা অন্য কেহ আপনাকে দিয়ে করিয়ে থাকে। আর যিনি গোলাম নহেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন, তিনি প্রতিকর্ম করেননা, বরং তিনি কর্ম করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “কর্ম এবং অকর্মের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা বুদ্ধিমান মনুষ্যও বুঝতে পারেননা।

অকর্মের (inaction এর) অর্থও আমাদেরকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা ভালভাবে বুঝতে হবে। আমরা সাধারণতঃ মনে করে থাকি যে কিছু না করে, কর্মহীন অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকার নাম ‘অকর্ম’ (inaction) কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নয়, সম্পূর্ণ ভুল।

কোন কর্ম না করাকে নৈষ্কর্ম বলা হয় না। কেহ কোন কর্ম না করলেই তিনি ‘নৈষ্কর্ম-সিদ্ধি’ লাভ করেছেন তা বলা যাবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বলেছেন,

“ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।”

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৪)

অর্থাৎ “কোন ব্যক্তি কর্ম আরম্ভই না করলে নৈষ্কর্ম্যতাকে প্রাপ্ত করতে পারেন না।” (নৈষ্কর্ম সিদ্ধি মানে যে অবস্থা বা স্থিতি লাভ করলে মানুষের

কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়, সেই কর্ম আর কোন ফল উৎপন্ন করতে পারেনা। কিন্তু শুধু মাত্র কর্ম পরিত্যাগ করলেই ভগবদ্ সাক্ষাৎকার রূপ সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়, তা নয়।)

যদি কোন ব্যক্তি কর্ম আরম্ভই না করে বলেন, "আমি কর্ম সন্ন্যাস (কর্ম পরিত্যাগ) করে দিয়েছি বলে নৈষ্কর্ম সিদ্ধি লাভ করেছি",—ইহা বলা মোটেই সত্য নয়। আমরা অকর্মণ্যতা (non-action) কে যে অকর্ম (inaction) বলে মনে করে থাকি, তা সম্পূর্ণ ভুল। অকর্মণ্যতা (nonaction) এবং অকর্ম (in-action) এক কথা নয়, বরং এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিছু না করাকে অকর্ম বলা হয়না। কেননা বাহ্য ভাবে হয়ত আপনি কিছুই করছেন না এবং হাত পা গুটিয়ে, চক্ষু-কর্ণ জিহ্বা বন্ধ করে চুপ্‌চাপ বসে আছেন, অথচ সে সময় আপনি মন দ্বারা অনেক কর্ম করতে পারেন, আকার ইঙ্গিত দ্বারাও অনেক কর্ম করতে পারেন। সকল ইন্দ্রিয় গুলির কাজ বন্ধ করেও মন দ্বারা অনেক রকমের সংকল্প-বিকল্প করলে, কামনা-বাসনার বশীভূত হয়ে কিছু চিন্তা করলে তা কর্ম বলেই গণ্য হবে, তাকে অকর্ম বলা যাবে না। এরূপ কর্ম করেও 'আমি কোন কর্ম করছিনা' তা বললে তাকে মিথ্যাচারী, ভন্ড (Hypocrat) বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভাষায় বিমূঢ়াত্মা বলা হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় স্পষ্ট ভাবে বলেছেন,

"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়াথার্ন বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৩।৬)

অর্থাৎ যে বিমূঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে অবরোধ করে মন দ্বারা ইন্দ্রিয় ভোগ করে থাকে (অর্থাৎ স্মরণ করতে থাকে) সেই ব্যক্তি মিথ্যাচারী বলে কথিত হয়।"

আপনি বাইরের ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ করেও মন দ্বারা ভিতরে ভিতরে অনেক কর্ম করতে পারেন। বাহ্যভাবে দেখা যেতে পারে যে আপনি কর্ম রহিত অবস্থায় অবস্থান করছেন, কিন্তু ভিতরে আপনার মন হয়ত যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে। আপনি হয়ত কোন চৌকির উপরে হাত পা লম্বা করে শয়ন করে আছেন, অথচ ঐ সময় আপনার মন হয়ত বাজারে ভ্রমণ করছে, মনে মনে কাউকে গালি দিচ্ছে বা কারো প্রশংসা করছে, মনে মনে না জানি কতই কর্ম করে চলছেন। হয়ত আপনি মনে মনেই গাড়ী ভাড়া করে কোথায়ও যাচ্ছেন, মনে মনে বিছানায় শয়ন করেই দৌড়া দৌড়ি করেছেন। আপনার এতসব মানসিক কর্মকে অকর্ম বলা যাবেনা।

রাত্রে আপনি হয়ত নিষ্ক্রিয় হয়ে, শরীর হাল্কা করে বিছানায় শয়ন করে আছেন, কিন্তু তখন স্বপ্নাবস্থায় হয়ত সারারাত ধরে দৌড়োদৌড়ি করছেন, হাসছেন বা কাঁদছেন। চুরি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদি অপ-কর্ম যা দিনের বেলায় করতে পারেন না তা হয়ত স্বপ্নের মধ্যে সারারত ধরে করেছেন, আবার হয়ত কোন সৎ, মহান, অত্যন্ত কঠিন কর্মও স্বপ্নের মধ্যে মনে মনে করেছেন। ঐ সময় আপনি অকর্ম অবস্থায় ছিলেন, তা বলতে পারবেন না।

সুতরাং দেখা গেল যে বাহ্য-ইন্দ্রিয় দ্বারা নিয়ত কর্ম হওয়া সত্ত্বেও অন্তঃকরণ ও মনে কর্ম ফলের কোন কামনা-বাসনা, আসক্তি, রাগ-দ্বেষ না রেখে, সমষ্টি কল্যাণের জন্য বা ঈশ্বর প্রীত্যর্থে, স্বধর্ম পালনের ভাবনা নিয়ে, সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে কর্ম হয়ে থাকে তাকে 'অকর্ম' বলা হয়। ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে 'কর্ম' এবং 'অকর্মের' মধ্যে যে গহন (জটিল) এবং সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তা যে ব্যক্তি বুঝতে পারেন তাঁকে বুদ্ধিমান বলে ধরা হবে। অকর্ম মানে আন্তরিক-মৌন (ভিতরের মৌন)। অর্থাৎ অন্তরে কর্মের কোন রকম তরঙ্গ যেন না উঠে, কর্ম-ফলে যেন কোন রকম আসক্তি, রাগ-দ্বেষ, কামনা-বাসনা না থাকে, কিন্তু বাইরে

কর্মের অভাব দেখা যাবে না, এরই নাম 'অকর্ম'। যখন হৃদয়ের মধ্যে কর্মের কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়, তখন সেই ব্যক্তি কর্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়ে পড়েন এবং তখন তার দ্বারা কার্য হয়ে থাকে। কিন্তু কর্ম ফলের বাসনা-আসক্তি, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি হৃদয়ে না থাকলে তিনি কর্মের কর্ত্তা-ভোক্তা হননা, বরং কর্ত্তা-শূন্য হয়ে থাকেন। তখন তাঁর শুধুমাত্র নিষ্কাম কর্মই অবশিষ্ট থাকে। আর এরই নাম অকর্ম।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর ১২৫ তম আবির্ভাব-বর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশ (ভাইজীর 'মাতৃ-দর্শন' গ্রন্থ থেকে নেওয়া)

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী বলেন—

১। ছোট্ট ছেলে যে ভাবে স্কুলে যায় সেইভাবে গুরুর কাছে যা'বে। পরমার্থের দিকে যতটা খালি হ'য়ে যাবে, ভগবান ততটাই ভরে দিবেন। সবটা তাঁকে দিলে তোমারও সবটা অন্তর বাহির তিনি পূর্ণ ক'রে দেবেন।

২। জীবনে অনেক বুদ্ধির খেলা খেলেছিস্। হার জিত যা' হবার হয়ে গেছে। এখন নিরাশ্রয়ের মতো তাঁর পানে চেয়ে তাঁ'রি কোলে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি। তোর আর কোনো ভাবনাই ভাবতে হবে না।

৩। জীবের দেহের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আত্মার দিকেই লক্ষ্য রেখে জীব-সেবা করবি; তা হলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি, সেবা, সেব্য ও সেবক তাঁরি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

৪। আমি তোদের ভালবাসি বলেই তো তোরা ভালবাসিস্; আমি যতো ভালবাসি তোরা যে তার এক কণাও আমায় ভালবাসিস্ না, তা তোরা বুঝিস্ না।

৫। ভোগমাত্রই খাদ্য। এ কারণে হুশিয়ার থাকবি, খাদ্য যেন তোদের না খায়। তোরা সর্বদা খাদ্যকে আত্মাধীনে রাখার চেষ্টা করবি।

৬। আমার কথা বিশ্বাস কর,—নাম জপ করো, নিশ্চয়ই ফল পাবে।

৭। শুভকর্ম করতে করতে অশুভ সংস্কারগুলি জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়; শুভ সংস্কার বাড়তে থাকে। ক্রমে তারাও লোপ পায়। যেমন কাঠ থেকে আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুনেই কাঠ ভস্ম হয়ে যায়; শেষে অগ্নিও নির্বাপিত হয়।

৮। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করবে,—'হে অন্তর্যামী দেবতা, প্রতি জীবের হৃদয়ে তোমার দিকে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তি ও অনুরাগ জাগিয়ে দাও।' সংসারের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন,

বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে ডেকে বলিও, 'দেখ তোমাদের যে প্রভু, এখন তাঁর নিকট যাচ্ছি—আমাকে তোমরা পথ ছেড়ে দাও' এই ব'লে নিশ্চল মনে আসনে বসবে।

৯। মনে খেলা দিও যত পারো,—সকল সময়ে। তাঁকে নিয়ে খেলাধূলা। তাঁর রূপ নিয়ে হোক, গুণ নিয়ে হোক, তাঁর বাণী, তাঁর নাম, তাঁর মহিমা নিয়ে হোক, যত বেশি সময় দিতে পার—এই খেলায় মত্ত থাকার চেষ্টা করবে। 'হচ্ছে না, হ'ল না, হবে না'—এ ভাবের বশে গা ঢালা দিয়ে থেকো না। সর্বদা স্মরণ রেখো—'হচ্ছে না' যে এই ভাব—সে তো কেবল আমারই ত্রুটি। 'আমাকে' জয় করতে হ'লে 'আমি' দিয়ে 'আমাকে' জয় করতে হবে। 'আমির' উপর জোর দেবে। 'আমি' ডাকবো তাঁকে, খেলবো 'আমি' তাঁর সাথে, তাঁকে পূজা করবো 'আমিই'।

১০। মালিকের সঙ্গে সব সময় যোগ রাখতে চেষ্টা করো। শিশু ঘুমিয়ে পড়ে রয়েছে, আর মা-বাপের সে দিকে কোনো খোঁজ নেই এ কখনো হয় না। যেখানেই থাকো, ঘরে হোক, অফিসে হোক ভগবানকে স্মরণ করতে পারো। বনে জঙ্গলে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

১১। ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ রয়েছেই। যদি সেটা বুঝতে না পারো, তুমি তাঁর সাথে একটি সম্বন্ধ পাতাও; তাঁকে পিতা বানাও, মাতা বানাও, পুত্র বানাও,—যা তোমার ইচ্ছা। এ থেকেই সুখ পাবে। তাঁকে ছাড়া তো জগতে কিছুই নেই।

১২। একটি শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে শব্দ করো, তোমার শব্দের প্রতিধ্বনি জাগবে। তেমনি মনকে যতো শূন্য করে তুলতে পারো, তোমার স্বরূপ আপনি ফুটে উঠবে। যার যেভাবে ভাল লাগে তাঁকে ডাকো, তাঁর মহিমার কথা ভাবো—তাঁর ভাবের মধ্যে তোমার সকল কামনা ডুবিয়ে দাও, তিনি আপন স্বরূপে দেখা দেবেন।

—

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী উপর ভাইজীর দু'টি বিশেষ বাণী ঃ-

১. "তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ হইবার নয় এবং তাঁহার স্মৃতি কালের অধীন নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। .... মোরা মিলি প্রাণে প্রাণে প্রণমি মা তব শ্রীচরণে।"

২. "প্রারব্ধ কাটিতে হইলে উৎকট তপস্যা চাই। শোক-দুঃখাদি আমাদের প্রারব্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল, ইহা নিশ্চিত ভাবে মনে রাখিয়া সকল সময়ে সম্পদে ও বিপদে তাঁহার অজস্র করুণা-ধারার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে হইবে।"

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী – বাণী ঃ-

★ শুভ বিবাহে আর্শীবাদ ঃ-
"ঋষি-পন্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ-ক্রিয়া হওয়া, ... ধর্মের আশ্রয়ে সংসার করা। "

★ "বিরুদ্ধের মধ্যেও অবিরুদ্ধ-ভাব রাখার চেষ্টা করা,.... বিরোধের সঙ্গে বিরোধ। (অর্থাৎ দ্বেষ বা বিরোধ-ভাব সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাজ্য)। তাতে পূর্ণ প্রকাশের যাত্রা হয়। "

★ "যতক্ষণ কর্ত্তব্য-বোধ আছে (অর্থাৎ কর্ত্তা-বোধ আছে)..... ততক্ষণ পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে, ... বীরের মত নিজ-কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করা। "

কর্মের সূত্র

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৩।৫ এবং ৩।৮ নং শ্লোকে বলছেন যে কোন মনুষ্য এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না। আবার মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর 'যোগ-দর্শনে' বলেছেন যে, কর্ম-সংস্কারের জন্যই জীবকে বিভিন্ন যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। সুতরাং কর্ম করেও কর্ম-বন্ধন এবং জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? কী কৌশলে কর্ম করলে কর্ম বন্ধনের হেতু না হয়ে কর্ম যোগে পরিণত হয়?

মনুষ্য জীবনের সুখ-দুঃখের মূলে রয়েছে ইহলোক এবং পূর্ব জন্মের কৃত-কর্মফল বা নিজ-প্ররব্ধ। কিন্তু নিজ-পুরুষার্থ অর্থাৎ পূর্ণ উদ্যম ও প্রয়াস ভাগ্য-ফলকেও পরিবর্ত্তন করে থাকে। তা কিভাবে সম্ভব?

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং করুণাময় ভগবানের কৃপা, সৎ-সঙ্গ, জপ-ধ্যান, সাধনা ইত্যাদি বিষয়গুলি কর্মফল ভোগে কী পরিবর্ত্তন ও কতটা কিভাবে সহায়তা করে থাকে?

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্যণীয় যে, অধর্মের জয়, শ্রীবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি। অপরদিকে যাঁরা জীবন-পথে সৎভাবে চলার চেষ্টা করেন তাঁদের অনেককেই কখনও দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ও চরম অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। এর কারণ কী?

কখনও কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে কর্ম-তত্ত্ব এবং মানব-জীবন সম্পর্কে উপরোক্ত আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক প্রশ্নগুলি উদিত হয়ে থাকে। এ সকল গূঢ়, দ্বন্দ্বাত্মক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জবাব সহজ-সরল উদাহরণের সাহায্যে, যুক্তি সঙ্গত ভাবে, শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে লেখক এই গ্রন্থে প্রদান করেছেন।

জয় মা।

স্বামী চেতনানন্দ গিরি